অন্যদিক

প্রসূন বসু

নবপত্র প্রকাশন

৫৯ পটুয়াটোলা লেন। কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১০ই পৌষ, ১৩৭১

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৫৯ পটুয়াটোলা লেন । কলিকাতা-৯

মুদ্রক : নিউ প্রিন্ট হাউস
২১ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : নীতিশ মুখোপাধ্যায়

প্রয়াত পিতৃদেব শ্যামলাল বসু-র

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

এই লেখকের অন্যান্য বই :

লাল্লু মহারাজ (কিশোর উপন্যাস)
পিলুর জন্যে (কিশোর উপন্যাস)
টনির স্বপ্ন (অনুবাদ)
বন্য শিকারী (অনুবাদ)
আঁটুল-বাঁটুল (ছড়া-সংকলন)

সবিনয় নিবেদন

বছর নয় আগে শ্রদ্ধেয় কবি মণীন্দ্র রায়ের তাগিদে সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় কাহিনীগুলি লিখেছিলাম। নাম ছিল 'অন্তভুবন', আর লিখেছিলাম 'সত্যকাম' ছদ্মনামে। মণীন্দ্রবাবুর তাগাদা না থাকলে রচনাগুলি কোনোদিন লেখা হতো কিনা সন্দেহ। তাগাদা মণীন্দ্রবাবুর থাকলেও তাগিদটা ছিল কিন্তু আমার ভিতরের। কিছু কথা প্রকাশের আগ্রহ আমি মনে মনে অনুভব করছিলাম অনেকদিন ধরে। এবং তার একটা বিশেষ কারণও ছিল। সে কারণ আমার মা।

সকল মা-ই বিশিষ্ট। তবু আমার মা স্বতন্ত্রভাবে বিশিষ্ট। আমার মা, আর অন্য সকলের মাসীমা। বর্তমানে ছিয়াত্তর বছর বয়স। অথচ তাজা উনিশের মতো সতেজ মন। পিঠ সোজা করে লম্বা লম্বা পা ফেলে এখনও তিনি সমানে হেঁটে চলেছেন। হেঁটে চলেছেন সামনের দিকে। পিছনে তাকাবার তাঁর ইচ্ছা বা অবসর কিছুই নেই। নিজের সন্তানদের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গ্রহণ করেছেন আরও অনেক অসংখ্য সন্তানের দায়িত্বভার। ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন, আর অসংখ্য অবহেলিতা মেয়েকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করছেন। কবে থেকে মা-র এই যাত্রাশুরু আমার জানা নেই, তবে শেষ এখনও হয় নি, দেখতেই পাচ্ছি।

অধিকাংশ মায়ের মতো তাঁর শিক্ষার মান অক্ষরজ্ঞান পর্যন্ত। 'সমাজসেবিকা' সম্মানে তিনি ভূষিতা নন। ইংরেজী উচ্চারণে বাংলা বলতে তিনি অনভ্যস্ত, ঘনঘন বিদেশ পাড়ি দেবার সৌভাগ্যও তাঁর হয় নি। কিন্তু সন্তান হিসাবে আমি গর্বিত যে, এমন পরম দরদী মানুষ আমি আর জীবনে দেখি নি। জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি জানেন, যতই বস্তাপচা পুরনো শোনাক না কেন, আমাদের সমাজে মেয়েরা আজও অবহেলিতা। এই সমাজব্যবস্থায় কোনোক্রমেই নারীমুক্তি সম্ভব নয়। তিনি বিশ্বাস করেন, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই

প্রকৃতঅর্থে নারীমুক্তি সম্ভব। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিটি সংগ্রামে তাই তিনি অগ্রণী, মিছিলের পুরোভাগেও দেখা যায় তাঁকে।

এই মহিয়সী মায়ের সন্তান হিসাবে আমি সামান্য কর্তব্য পালনের চেষ্টা করেছি মাত্র। তাঁর কাছাকাছি থেকে যে-অসংখ্য জীবনসংগ্রাম দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে আমার, তারই কয়েকটি চিত্র তুলে ধরলাম এখানে। আমি নিশ্চিত যে প্রতিটি পাঠকই এঁদের চিনতে পারবেন। কারণ, তাঁরা হয় আমাদের মা, নয় বোন, নয়তো বা সহধর্মিণী। তাঁদের সকলের মনের মাঝে একটা সুরই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে: আমরা বাঁচতে চাই, আমরা মুক্তি চাই।

প্রতিটি কাহিনী স্বতন্ত্র হলেও এই বিশেষ সুরটিকেই আমি আমার ক্ষুদ্র সাধ্যমতো এই গ্রন্থে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। রচনাগুলির কতটুকু সাহিত্যমূল্য আছে আমি জানি না। আর সে দাবীও আমার নেই। নাই বা থাকুক, তবু তো আমি কিছু কথা বলবার চেষ্টা করেছি, যে-কথাগুলি জীবন থেকে নেয়া, জীবনেরই কথা। জীবনধর্মী এই রেখাচিত্রগুলি পাঠকদের ভালো লাগলেই আমি খুশি।

প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হচ্ছে। নতুন মুদ্রণে অন্য কিছু সংযোজন করি নি। শুধুমাত্র পুরনো মুদ্রণপ্রমাদগুলিই এবার সংশোধন করে দিলাম। আশা করি সহৃদয় পাঠকদের সহযোগিতা থেকে এবারও বঞ্চিত হব না।

প্রসূন বসু

লোরা

একটা চাপা কোলাহল সমস্ত ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল। আলো-আঁধারি পরিবেশ। কাছের মানুষকেও স্পষ্ট দেখা যায় না। শুধু ফিসফাস শব্দ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। কেউবা নিঃশ্বাস বন্ধ করে চুপচাপ বসে আছে। রক্তের মাঝে তীব্র উত্তাপ অনুভব করছে।

মস্তবড় হলঘর। প্রায় গায়ে গা ঠেকিয়ে চেয়ার-টেবিল সাজানো। ঘরের এক কোণায় একটু উঁচু করে মঞ্চ তৈরি হয়েছে। সুসজ্জিত মঞ্চ। লাল, নীল, হলুদ, বেগুনি রঙের আলো মঞ্চের উপর নেচে-নেচে বেড়াচ্ছে। পুতুলের মতো কয়েকটা মানুষ বাজনার যন্ত্রপাতি নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। প্রত্যেকের ঠোঁটের কোণে হাসি। ঠিক যেন নিক্তিতে ওজন করা।

দেওয়ালে টাঙানো অজস্র ফরাসী নৃত্যভঙ্গিমার ছবি। মঞ্চের দুই পাশের দেওয়ালে ফরাসী নৃত্য ক্যানক্যান-এর ছবির পাগুলো ক্যানভাস টপকে যেন মানুষগুলোর গায়ে এসে পড়ছে।

একটি ছবির নিচে এসে দাঁড়াল লোরা। আর সঙ্গে সঙ্গে চাপা কোলাহল সমস্ত ঘরটায় ছড়িয়ে পড়ল। লোরার সর্বাঙ্গ রক্ত-নাচানো এক অদ্ভুত পোশাকে আবৃত। কালো রঙের জামা পরেছে লোরা।

তার গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা। পোশাকের রঙ আর গায়ের রঙে এক অদ্ভুত 'কনট্রাস্ট' সৃষ্টি হয়েছে। সমস্ত শরীরের সঙ্গে যেন লেপ্টে আছে পোশাক। দেহের প্রতিটি রেখা স্পষ্ট। হাঁসের গলার মতো নগ্ন বাহু। উন্মুক্ত আকাশের মতো নগ্ন পিঠ। রেশমের মতো নরম বাদামী রঙের চুলের গুচ্ছ আলগোছে নগ্ন পিঠের উপর এলায়িত। অর্ধোন্মুক্ত বুকের উপর রঙ-বেরঙের পুঁথির মালা। অন্ধকারে মুক্তোর মতো জ্বলজ্বল করছে।

মাইক্রোফোনের মাউথপিসকে আদর করার ভঙ্গিতে বুকের কাছে টেনে নিয়ে লোরা গান ধরল। পুতুলের মতো মানুষগুলো হঠাৎ জেগে উঠেছে। ড্রাম বেজে উঠল। স্যাক্সোফোন-এ ছড়িয়ে পড়ল সুর। লোরা নিজে বাজাচ্ছে ম্যারাকাস। অনেকটা ঝুমুরের মতো। একটা সস্তা পপ্-সঙ্গীতের সুর ছড়িয়ে দিতে লাগল লোরা। চাপা কোলাহল সোচ্চারে পরিণত হল।

মঞ্চের কাছাকাছি বসা এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক পানপাত্র হাতে সম্বর্ধনা জানালেন লোরাকে। মাথা নিচু করে, সমস্ত শরীরটাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে অভিবাদন গ্রহণ করল লোরা। তারপর ঠোঁটের কোণের হাসিকে টুকরো-টুকরো করে যেন দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে দিল। বেয়ারারা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, জায়গা না পেয়ে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে। কেউবা এসেছে ডিনারে। কেউবা শুধু চা বা কফি, কেউবা মদের নেশায়। টেবিলে সাজানো হুইস্কি, জিন, রাম বা বিয়ারের বোতল।

মৃদু আলোর রেখা লোরার সমস্ত দেহে ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি যেন একটা হারিয়ে যাওয়া জিনিস খুঁজছে মনে হয়।

পায়ের দুটি গোড়ালির উপর ভর দিয়ে সমস্ত শরীরটাকে নাচাচ্ছে লোরা। তীব্র চঞ্চল হয়ে উঠছে দেহের প্রতিটি রেখা। মাঝে মাঝে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। পায়ের গোড়ালি থেকে একটা ছন্দ যেন নেচে-নেচে ঠোঁটের মাঝে এসে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ঠোঁটের

কোণায় মোহিনীর হাসি ফুটিয়ে রেখেছে লোরা। যেন সবাইকে সে আহ্বান করছে। কাজল-জড়ানো চোখের মোহিনী দৃষ্টি অনেকেরই রক্তে নেশা জাগিয়ে তুলেছে।

সুরের রেশটুকু দর্শকের মাঝে ছুঁড়ে দিয়ে গান থামাল লোরা। করতালিতে ভরে উঠল সমস্ত ঘর। লোরা মাথা নিচু করে প্রত্যেকের অভিবাদন গ্রহণ করল। তারপর মঞ্চ থেকে নেমে এল। অসংখ্য জোড়া-চোখ লোরার সমস্ত দেহটাকে যেন চারদিক থেকে বিদ্ধ করছে। মধ্যবয়স্ক সেই ভদ্রলোক আসন ছেড়ে লোরার দুই হাত ধরে অভিবাদন জানালেন। শুধু রাজকীয় অভিবাদনে তাঁর মন ভরছিল না। ভদ্রলোকের নেশা ধরেছে।

অসীম বিস্ময়ে সমস্ত দৃশ্যটা আমি লক্ষ্য করছিলাম। ম্যানেজারের কাছাকাছি এক কোণায় একটা টেবিলে আমি একা চুপচাপ বসে-ছিলাম। অভ্যস্ত পারদর্শিতার সঙ্গে হাত ছাড়িয়ে লোরা সোজা এসে আমার টেবিলের সামনে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। নিজের অজান্তেই আমি কেমন যেন চমকে উঠলাম। লক্ষ্য করলাম অজস্র প্রলুব্ধ চোখ আমাকে লক্ষ্য করছে।

বসার আগে সমস্ত চোখে-মুখে হাসি ফুটিয়ে লোরা জিজ্ঞেস করল, বসতে পারি?

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, নিশ্চয়।

ম্যানেজার ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। কেন ঠিক বুঝতে পারলাম না।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে লোরার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, সিগারেট?

লোরা হাসল, নো—থ্যাঙ্কস।

আমি সিগারেট ধরিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, কফি।

লোরা একই রকমভাবে হেসে জবাব দিল, নো—থ্যাঙ্কস।

কেমন যেন সম্মানে লাগল আমার। আমি লোরার কথাকে ভ্রুক্ষেপ না করে কফির অর্ডার দিলাম।

লোরা হাসল। আড়চোখে আমার সর্বাঙ্গ লক্ষ্য করল। কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করল না। তারপর ব্যাগ থেকে ছোট্ট আয়না, লিপস্টিক আর রুমাল বের করে মুখের প্রসাধন ঝালিয়ে নিতে লাগল।

কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ করছিলাম। সোজা আমার টেবিলে এসে লোরা কেন বসল কিছুতেই তা আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমি তো এখানকার খদ্দের নই। আমার উপস্থিতি তো একান্ত-ভাবেই আকস্মিক। আলোঝলমল পার্ক স্ট্রীট এলাকায় নিওন আলো সজ্জিত রেস্তোরাঁয় ঢোকার মতো ক্ষমতা আমার নেই। একশ' টাকার নোটের যেখানে ছড়াছড়ি, দশ টাকার একটা নোট পকেটে করে সেখানে ঢোকা অনেকটা অনধিকারচর্চা। রাতের পার্ক স্ট্রীট ঘামে-ভেজা কলকাতার স্বর্গোদ্যানের মতো। ব্যবসাদার আর বড় বড় চাকুরেদের অবসর বিনোদনের স্থান। নতুন নতুন ব্যবসাও অবশ্য জন্ম-লাভ করে এই সব রেস্তোরাঁয়। আলো-আঁধারি পরিবেশে, মদের নেশায় অজস্র দেনা-পাওনার হিসাব হয়। আমার মতো সাধারণ মানুষ এখানে বাহুল্য, বলা যায়, সমস্ত রকম হিসাবেই উদ্বৃত্ত।

কলকাতায় এই জাতীয় রেস্তোরাঁর সংখ্যা বাড়ছে। অবস্থা না থাকলেও কিছু কিছু মধ্যবিত্তকেও মাঝে মাঝে দেখা যায়। মানুষ ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে উঠছে। বছর দেড়েক আগেও এই সব রেস্তোরাঁর 'বার-লাইসেন্স' ছিল না। এখন লাইসেন্স জুটেছে। মদের আয়োজন আছে। পরিবেশও ধীরে-ধীরে মদের নেশার মতো ঘোলাটে হয়ে উঠছে।

আমি লোরার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এই সব কথা ভাবছিলাম। বিচিত্র এই সব মানুষকে আনন্দদানের জীবিকা গ্রহণ করেছে লোরা। সঙ্গীতের মাধুর্যের চেয়ে যৌনতার উল্লাসই এখানে বেশি। লোরা

যখন গান গাইছিল তখন তার দিকে তাকিয়ে আমি একথা প্রচণ্ডভাবে অনুভব করছিলাম।

আমার দিকে লোরার খুব নজর আছে বলে মনে হচ্ছিল না। ছোট্ট আয়নায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সে তার নিজের রূপ অবলোকন করছিল।

বেয়ারা কফি দিয়ে গেল। যাওয়ার সময় মুচকি হেসে গেল ছোকরা বেয়ারা। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, লোরা চোখ টিপল বেয়ারাকে।

পুতুলের মতো মানুষগুলো মঞ্চের উপর আবার নড়েচড়ে উঠেছে। পিছন থেকে কেউ তাদের দম দিয়েছে নিশ্চয়। সুরে-সুরে তারা একটা রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করে তুলেছে।

কাপে কফি ঢালল লোরা। তারপর আমার দিকে একটা কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল, ধন্যবাদ।

আমি মৃদু হাসলাম। কোনো জবাব দিলাম না। আমার চোখের দৃষ্টি লোরাকে তখন গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে।

স্থির দৃষ্টি মেলে আমি লোরার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কফির ধোঁয়া মাঝে-মাঝে আমার আর লোরার মাঝে একটা দেওয়াল সৃষ্টি করছিল। ধোঁয়ার আবডালে আরও বেশি মোহময় মনে হচ্ছিল লোরাকে।

লোরা আকস্মিকভাবে প্রশ্ন করল, কি দেখছ?

আমি চোখ নামিয়ে নিলাম। কোনো জবাব দিতে পারলাম না, কেমন যেন লজ্জা পেয়ে গেলাম। সত্যিই কি বিশ্রী হ্যাংলার মতো আমি লোরার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

লোরা বোধহয় আমার মনের ভাব বুঝল। বলল, খুব অবাক লাগছে আমাকে, তাই না?

এবারও আমি চুপ করে থাকলাম। কোনো জবাব দিলাম না।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে লোরা হেসে উঠল।

ছেলেমানুষের মতো আমি লজ্জায় চুপসে গেলাম।

মধ্যবয়সী সেই ভদ্রলোক আর সহ্য করতে পারলেন না। স্বাভাবিক। বলা নেই, কওয়া নেই, আমি লোরার সঙ্গে বেশ জমিয়ে তুলেছি। উড়ে এসে যেন জুড়ে বসেছি।

ভদ্রলোকের পা টলছিল। লোরার চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। তারপর জড়ানো কণ্ঠে বললেন, কি হে, ছোকরার সঙ্গে বেশ জমিয়ে তুলেছ যে!

হাসি-হাসি মুখে ভদ্রলোকের দিকে আড়চোখে তাকাল লোরা। ভদ্রলোক আর একটু ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করলেন। চেয়ারের অন্য পাশে নিজেকে সরিয়ে নিল লোরা। এ বোধহয় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আক্রমণের হাত থেকে তাই মুখে হাসি ফুটিয়ে নিজেকে বাঁচাতে শিখেছে।

উত্তেজনায় আমি দাঁতে দাঁত চাপলাম। মনে মনে উচ্চারণ করলাম, জঘন্য। পরক্ষণেই মনে হল অর্থহীন। আমারই চোখের দোষ। স্বাভাবিকতাই আমার কাছে অস্বাভাবিক ঠেকছে। খরিদ্দার সম্মানিত অতিথি। অতিথির প্রতি কোনোরকম খারাপ ব্যবহার চলবে না। তা সে যে-জাতেরই হোক। অতিথির প্রতি দৃষ্টি রাখা লোরার পবিত্র কর্তব্য। তার চাকুরীর অন্যতম প্রধান শর্ত।

লোরা একথা জানে। দিনে দিনে নিজেকে সেভাবে অভ্যস্ত করে তুলেছে। তাই চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে ভদ্রলোকের কাঁধে একটা চাপ দিয়ে বললে, চার্মিং।

ভদ্রলোক কোনো জবাব দেওয়ার আগেই নগ্ন পিঠটাকে দর্শকদের সামনে এলিয়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল লোরা। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হলঘর আবার চঞ্চল হয়ে উঠল।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি লোরার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। একই রকমভাবে মাউথপিসকে আদর করার ভঙ্গিতে বুকের মাঝে টেনে নিয়ে লোরা গান ধরল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম এগারোটা বাজে। বিল চুকিয়ে বেরিয়ে এলাম। লোরার জন্যে অজান্তে কেমন যেন একটু কৌতুক অনুভব করছিলাম। লোরার রক্তনাচানো চেহারা বারবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। আমি নিজেই অনুভব করছিলাম ধীরে ধীরে আমার মুখের রঙ পাল্টাচ্ছে। লোরার চোখের ভাষায় যেন অনেক কিছু বলবার ছিল। বলতে পাবে নি। আর বুঝবার মতো ক্ষমতাও বোধহয় আমার ছিল না।

দমবন্ধ আবহাওয়া থেকে বাইরে বেবিয়ে বুক ভবে নিঃশ্বাস গ্রহণ করলাম।

এরপর অনেক দিন কেটে গেছে। মাস তিনেক হবে নিশ্চয়। যথারীতি লোরার কথা ধীরে ধীরে ভুলতে বসেছি। মাঝেমধ্যে লোরাকে দেখার জন্যে অবশ্য মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। পকেটের দিকে তাকিয়ে মনের ইচ্ছা মনে মনেই মুছে ফেলেছি।

রবিবারের সকাল। এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা কবে এলিয়ট বোড ধরে ফিরছি। হঠাৎ লোরাকে দেখে চিনতে পারলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন চমকে উঠলাম। এবং এই প্রথম বুঝতে পারলাম লোরার বয়স হয়েছে। চল্লিশ পেরিয়ে গেছে নিশ্চয়। আমার উল্টো দিক থেকে লোরা এগিয়ে আসছিল। পরনে খুব সাদাসিধে পোশাক। চমক জাগানোর কোনো লক্ষণই নেই। লোরার হাত-ধরা একটি বছর পাঁচেকের ছেলে। সুন্দর ফুটফুটে চেহারা। মুখের আদলের সঙ্গে অদ্ভুত মিল আছে।

ঠিক আমার সামনাসামনি এসে লোরা দাঁড়াল। আমাকে কি তাহলে চিনতে পেরেছে? ঝুঁকে পড়ে ছেলেটির কানে কানে কি কথা বলল আর সঙ্গের ছেলেটি খিলখিল করে হেসে উঠল। ভোরের সূর্যের মতো লোরার চোখেমুখেও তৃপ্তি ছড়িয়ে পড়ল যেন।

ছেলেটির মিষ্টি গালে ছোট্ট একটা চুমু খেল লোরা। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট দুই হাতে লোরাকে জড়িয়ে ধরল।

আমি অবাক হয়ে সমস্ত দৃশ্যটা লক্ষ্য করছিলাম।

লোরা আমাকে চিনতে পারে নি। পাশ কাটিয়ে চলে গেল। খুব ইচ্ছে হল একবার ডাকি। কিন্তু কি জানি কেমন যেন খারাপ লাগল। ডাকতে পারলাম না!

মনে মনে বললাম, না চেনাই স্বাভাবিক। প্রতিদিন কত লোককেই তো সে দেখছে। কত রকমভাবে। তবু সেদিন কেন লোরা সমস্ত প্রলুব্ধ চোখ এড়িয়ে, সোজা আমার টেবিলে বসে আমার মতো একজন নগণ্য মানুষের সঙ্গে কফি পান করল, সে-রহস্য আমার কাছে আশ্চর্য ঠেকল। জিজ্ঞাসু মন বার বার যেন এর উত্তর খুঁজতে লাগল। না জানিয়ে, না বুঝিয়ে লোরার পিছু নিলাম। অনেকটা অভদ্রের মতোই। কিছুদূর সোজা এগিয়ে বাঁদিকে একটা অন্ধকার গলিতে লোরা ঢুকে পড়ল। বুঝলাম, এবার ফিরে যাওয়া উচিত। আর এগুনো সমীচীন নয়। আশ্চর্য, লোরা একবারও পেছন ফিরে তাকাল না।

সারাদিন ধরে মনটা কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে থাকল। কোনো কাজে মন লাগছে না। লোরা আর তার হাত-ধরা শিশুটির মুখ কেবলই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আর একটা প্রশ্ন বারবার ভিমরুলের মতো মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে।

শেষকালে এক বন্ধুর থেকে কিছু টাকা ধার করে পার্ক স্ট্রীটের সেই আলো-আঁধারি পরিবেশের রেস্তোরাঁয় গিয়ে হাজির হলাম সেদিন রাত্রে। বেয়ারা সেলাম ঠুকে দরজা খুলে দিল। ঢুকে দেখি মঞ্চের মাঝে বুকের কাছে একই রকমভাবে মাউথপিস ধরে গান গাইছে লোরা। অন্যহাতে টাইটুম্বুর বাজাচ্ছে।

সেদিনের তুলনায় ভিড় একটু কম মনে হল। অনেকের বোধহয় এখনও আসার সময় হয় নি।

লোরার চোখে চোখ পড়ল। কিন্তু আমাকে চিনতে পারার কোনো লক্ষণ দেখলাম না। বর্ষাভেজা ঘাসের মতো গাঢ় সবুজ রঙের পোশাক পরেছে লোরা। আজ যেন ওকে আরও সুন্দর লাগছে।

মঞ্চ থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা খালি আসন পেয়ে বসে পড়লাম। বেয়ারা আসতেই অর্ডার দিলাম, কফি। ঐ পর্যন্তই আমার দৌড়।

লোরা গান থামাল। করতালির শব্দে ভরে উঠল ঘর। শব্দ-গুলো দেওয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে আছাড় খেতে লাগল। অনেকেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ মুখে অদ্ভুত এক আওয়াজ করে লোরাকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছে। মাথাটাকে প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি ঠেকিয়ে লোরা অভিবাদন গ্রহণ করছে প্রত্যেকের।

মধ্যবয়সী সেই ভদ্রলোককে আজ আর দেখতে পাচ্ছি না। নতুন রূপের সন্ধানে অন্য কোনো রেস্তোরাঁয় গিয়ে হয়তো একইরকম দৃশ্যের অবতারণা করছেন।

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আমি লোরাকে দেখছিলাম। এলিয়ট রোডের অন্ধগলির লোরার সঙ্গে এ-লোরার কত তফাৎ। দু'টি যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা।

মঞ্চ ছেড়ে নিচে নেমে এল লোরা। অনেকেই হাত বাড়িয়ে তাদের টেবিলে বসবার জন্যে তাকে অনুরোধ জানাতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য, লোরা হাসিমুখে তাদের প্রতিটি অনুরোধকে প্রচণ্ড অবজ্ঞাভরে এড়িয়ে সেদিনের মতো সোজা এগিয়ে এসে আমার টেবিলের সামনে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। যেন কত দিনের পরিচয়। কত দিনের আত্মীয়তা।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার বিস্ময় লোরা বুঝল। বলল, অবাক হচ্ছ?

আমি মাথা নেড়ে জানালাম, হ্যাঁ।

চোখের পাতাদুটো বন্ধ করে ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলল লোরা। তারপর টেবিলে রাখা আমার প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে মস্তবড় একটা পরিতৃপ্তির ধোঁয়া ছাড়ল।

অবাক চোখে আমি লোরার দিকে তাকিয়েছিলাম। আমার গলাটা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছিল। গলা দিয়ে যেন স্বর বেরুতে চাইছে না।

লোরা কথা বলল। একরাশ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে, সকালে ওখানে আমাকে দেখে খুব অবাক হয়েছিলে, না?

আমাকে তুমি চিনতে পেরেছিলে? হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কথাটা।

লোরা হাসল, না চিনলে আর বললাম কি করে?

আমাকে তোমার মনে আছে কি করে! সাহস পেয়ে জিগ্যেস করলাম।

কারণ, তুমি এ-রেস্তোরাঁর অন্যদের মতো নও। লোরা সংক্ষিপ্ত জবাব দিল।

হঠাৎ নিজেকে কেমন মহান মনে হল। পরিতৃপ্তির হাসি হাসলাম। তারপর নিজের অজান্তেই কেমন করে যেন সহজ হয়ে গেলাম লোরার সঙ্গে।

মাঝখানে একবার মঞ্চে উঠে হাস্যেলাস্যে খরিদ্দারের রক্ত চঞ্চল করে আবার আমার টেবিলে ফিরে এল লোরা।

তারপর টুকরো-টুকরো কত কথা হল। এক-এক করে তার জীবনরহস্যের সমস্ত পর্দা আমার সামনের থেকে সরিয়ে নিল লোরা। এক নতুন রূপে যেন আমি দেখতে পেলাম এলিয়ট রোডের অন্ধগলির একটি সাধারণ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান গৃহস্থবধূকে। ফুটফুটে সুন্দর শিশুটির যে জননী।

গান গাওয়ার গলা লোরার ছোটবেলা থেকেই ভালো। কিন্তু এভাবে রেস্তোরাঁর গায়িকার জীবিকা তাকে নিতে হবে তা সে ভাবেনি কোনদিন। স্বামীর সামান্য আয়। সংসার চালানো কঠিন।

তাই বছর-দেড়েক আগে আকস্মিকভাবে যেদিন এ-কাজ জুটে গিয়েছিল, সেদিন লোরা 'না' বলতে পারে নি।

ফরেন-এক্সচেঞ্জের কল্যাণে বিদেশী শিল্পীদের আসা সরকার বন্ধ করেছেন। তাই লোরার মতো মেয়েদের কপালে জুটেছে পার্ক স্ট্রীট রেস্তোরাঁর মতো অভিজাত রেস্তোরাঁর গায়িকার চাকুরী। বেতন যে খুব লোভনীয়, তা নয়। তবে ভালোমন্দ ডিনার জোটে। আগের তুলনায় লোরার সংসার অনেকটা স্বচ্ছল। ছেলেকে ভালো স্কুলে পড়াচ্ছে।

অবাক হয়ে লোরার কথাগুলো শুনছিলাম। মনটা কেমন যেন ভারি-ভারি ঠেকছিল। লোরাকে মনে হচ্ছিল যেন বড় কাছের মানুষ। বড় বেশি চেনা-চেনা।

আমি অনেকটা সাহস পেয়ে গেছি। সহজভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম, কত রকমের লোক তো এখানে আসে দেখছি। তোমাকে অন্যরকমভাবে কেউ চায় না।

লোরা হাসল। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, চায়।

তুমি কি কর? আমি বোকার মতো প্রশ্ন করলাম।

লোরা আমাকে উল্টো প্রশ্ন করল, তোমার কি মনে হয়?

বুঝলাম, এরকম প্রশ্ন করা আমার অন্যায় হয়ে গেছে। চুপ করে থাকলাম।

লোরা একটা সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, আমি তো সংসারী লোক। তবে এ-লাইনে অনেকে আছে যারা ওসব চাওয়ায় সাড়া দেয়। এবং তাতে কোনো সংকোচবোধ করে না। ওটাও তাদের একটা উপজীবিকা বলতে পার।

আরও হয়তো অনেক প্রশ্ন করতাম লোরাকে। রহস্যের হয়তো আরও সন্ধান করবার চেষ্টা করতাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম, আমার যে-কোনো প্রশ্নের জবাব লোরার কাছ থেকে সহজভাবে পাব। লোরা অনেক সহজ হয়ে উঠেছে আমার কাছে।

হঠাৎ মাইকে ঘোষণা ভেসে এল, এবার লোরা আপনাদের অভ্যর্থনা জানাবে।

চাপা কোলাহল আবার ফেটে ফেটে পড়ল।

আমার হাতে একটা মৃদু চাপ দিয়ে লোরা উঠে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি লক্ষ্য করলাম, হঠাৎ লোরার চোখমুখের রঙ পাল্টে গেছে। এখন সে সাধারণ গৃহস্থবধূ নয়। সমস্ত আসরের অসাধারণ নায়িকা। সমস্ত হলঘরটা ধীরে ধীরে কখন ভরে উঠেছে খেয়াল করি নি একেবারে।

বিল চুকিয়ে বেরিয়ে আসার সময় পিছন ফিরে লক্ষ্য করলাম, গোড়ালির উপর ভর দিয়ে সমস্ত শরীরটা নাচিয়ে নাচিয়ে উদ্দাম চঞ্চলতায় গান করছে লোরা। আর সেই আলোর রেখাটা তার দেহ ঘুরে-ঘুরে ঢেউয়ের মতো ঝিকমিকিয়ে কি যেন খুঁজছে। কি খুঁজছে কে জানে?

সোনামুখী

কিভাবে যে সেদিন আমি সোনার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলাম, তা এত বছর পরে আজ আর আমার সঠিক মনে নেই। সোনা কোথায় তাও আমি জানি না। আর কোনদিন আমি সোনাকে দেখি নি।

কিন্তু এখনও চোখ বন্ধ করলে স্পষ্ট সোনার মুখখানা আমার স্মৃতির পটে ভেসে ওঠে। গভীর বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে আমার দিকে যেন তাকিয়ে আছে সোনা। বিষণ্ণতাকে আড়াল করবার জন্য মাঝে মাঝে সোনা হাসছে। আর হাসবার সময় তার ঝকঝকে দাঁতগুলো একগুচ্ছ বেলকুঁড়ির মতো আমার চোখের সামনে মেলে ধরছে। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাই—হাসবার সময় কি সুন্দর ছুটো টোল পড়েছে সোনার গালে। সোনার ঠোঁটের নিচের সেই ছোট্ট কালো তিলটা আজও আমার মনকে উদাস করে দেয়।

আজ এত বছর পরেও শিয়ালদা স্টেশনের কাছাকাছি রথের মেলা বসলে আমি ঘোরাফেরা করি। কেন, তা ঠিক আমি বোঝাতে পারব না। হয়তো আমি নিজেও জানি না।

রথের মেলার সময় শিয়ালদা থেকে শুরু করে জোড়াগির্জা পর্যন্ত যখন আকস্মিকভাবে অজস্র তাঁবু গজিয়ে ওঠে, আর বিচিত্র ঢংয়ের

মানুষের ছবিআঁকা পর্দার সামনে রঙ-কালি মেখে আজগুবি সাজ-পরা ক্লাউনরা দর্শকদের আকর্ষণের জন্য নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে বক্তৃতা দিতে থাকে, তখন মাঝে মাঝে আমি নিজের অজান্তেই দাঁড়িয়ে পড়ি। কি জানি, আমার বার বার মনে হয়, এই সব তাঁবুর ভিতরে, পর্দার অন্তরালে, সোনা থাকলেও থাকতে পারে। এরকমভাবে কতদিন যে আমি পর্দার অন্তরালে ঢুকেছি আর গভীর বিষণ্ণতায় সারা দেহ-মন আচ্ছন্ন করে ফিরে এসেছি, তার হিসেব নেই। তবু এ যেন আমার একটা নেশা। এ নেশার হাত থেকে আমি কিছুতেই নিজেকে বাঁচাতে পারি না। কেন? আমি ঠিক জানি না। আমি নিজেকেও নিজে অনেকবার প্রশ্ন করেছি। কিন্তু কোনো উত্তর পাই নি।

ঠিক এমনি এক রথের মেলায়। যতদূর মনে পড়ছে সেদিন বোধহয় রথের দিনই ছিল। অজস্র মানুষের ভিড়। বৌ-ছেলে-মেয়ের হাত ধরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে সবাই। এ যেন এক নতুন কলকাতা। গ্রামের সমস্ত স্বাভাবিক আর সহজাত প্রবৃত্তি যেন এখানে জেগে উঠেছে। মেলায় যারা কেনাকাটা করছে তারা অনেকেই জানে এসব জিনিস কলকাতা শহরে যখন-তখন পাওয়া যায়। তবু মেলায় কেনার একটা আনন্দ আছে।

তবে, মেলার আসল বৈশিষ্ট্য তার কেনাকাটার মধ্যে সীমিত নয়। এই যে শিয়ালদা স্টেশন থেকে জোড়াগির্জা পর্যন্ত পর পর সাজানো অজস্র তাঁবু সেখানেই প্রকাশিত আসল মেলার রূপ। অন্তত সেদিন আমার তাই মনে হয়েছিল। আর মনে হয়েছিল বলেই সেই বিশিষ্ট রূপের ছবি মনে বহন করে আজও আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি।

তখন আমার বয়স অল্প। সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছি। জীবনের অভিজ্ঞতা কম। পথের মাঝে যা কিছু পাই, সবই কুড়িয়ে নিতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, দেরি হলেই হারিয়ে ফেলব। জীবনকে বুঝবার এবং জানবার গভীর আগ্রহ।

আর গভীর আগ্রহভরেই আমি সেই তাঁবুর সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। সেদিন আমি শুধু একা নই। আমার মতো আরও অনেকে।

তাঁবুর সামনে সমুদ্রের রঙের মতো একটা নীল পর্দা। পর্দার গায়ে আঁকা কালীঘাটের পটের ঢংয়ে একটি মেয়ের ছবি। পর্দাটা অনেক দিনের পুরানো মনে হয়। জায়গায় জায়গায় রঙ উঠে ভিতরের ফ্যাকাশে শাদা বেরিয়ে এসেছে। মেয়েটির ছবির ঠিক বুকের কাছে কিছুটা অংশের রঙ উঠে বিশ্রী কদর্য লাগছে। আমার ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে আমারই বয়সী একটি ছেলে তার বন্ধুকে আঙ্গুল উঁচিয়ে দৃশ্যটি দেখাচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে ঠ্যালা মেরে কি যেন বলাবলি করছিল।

পর্দার সামনে বাঁশ বেঁধে উঁচু মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। মঞ্চের উপর কিম্ভুতকিমাকার পোশাক পরে একটি লোক মুখে চোঙা ধরে অনর্গল চেঁচিয়ে যাচ্ছে ঃ আজব-আজব খেল দেখে যান বাবু। সোনামুখীর নাচ দেখে যান বাবু। হারালে আর পাবেন না বাবু। কি হারাচ্ছেন জানেন না বাবু। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপরে অনর্গল সোডার বোতলের ছিপি খোলার মতো ভক-ভক করে আরও অনেক কথা বলছিল লোকটি। আরও যে কি কি বলেছিল, তার সবটা আজ আমার স্পষ্ট মনে নেই। তবে, এটুকু মনে আছে, তারপর সোনামুখীর রূপের বর্ণনা দিচ্ছিল লোকটি। তার নিখুঁত বর্ণনার গুণে সোনামুখীর দেহের প্রতিটি অংশ দর্শকদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠছিল। সোনামুখী যে বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপসী তা সে হাবে-ভাবে, কথাবার্তায় ভালো করেই বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

বিস্ময়ভরা চোখে সেদিন আমি লোকটির দিকে তাকিয়েছিলাম। লোক বশীভূত করবার অদ্ভুত ক্ষমতায় আমি তার তারিফ না করে পারছিলাম না। তার অনর্গল বক্তৃতার ধাঁধায় কত লোক যে সেদিন যন্ত্রচালিতের মতো তাঁবুর ভিতরে ঢুকেছিল তা আজ আর মনে

নেই। তবে, সেদিন আমিও ছিলাম তাদেরই একজন। নিজেই নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে সেদিন আমি তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করেছিলাম। আর তাঁবুর অন্তরালের সমস্ত দৃশ্য আজও আমার সামনে জীবন্ত ছবির মতো ভেসে ওঠে।

তাঁবুর এক কোণায় একটি খাটিয়া পাতা। উপরে একটি পুরানো সতরঞ্চি বিছানো; সামনে খানকয়েক চেয়ার। পিছনের দিকে গ্যালারী। হ্যাঁ, স্পষ্ট মনে আছে। প্রথম সারিতে আমি বসেছিলাম। একটা বিশ্রী সোঁদা সোঁদা গন্ধ সতরঞ্চি থেকে ভেসে আসছিল।

হঠাৎ বাজনা বেজে উঠল। গাঁয়ের যাত্রার কনসার্টের মতো। মঞ্চের পিছনে লাল শালুর পর্দা। পর্দার পিছন থেকে বাজনা ভেসে আসছিল।

দর্শকরা সবাই চঞ্চল হয়ে উঠল। আমি সামনে-পিছনে নিচে-উপরে চারদিকে তাকালাম। সমস্ত দৃশ্যটা মনের মাঝে এঁকে নিতে চাচ্ছিলাম। তাঁবুর উপরের দিকটা বেশ খানিকটা ছেঁড়া। সেখান দিয়ে পরিষ্কার আকাশ দেখা যাচ্ছিল। আমি মাঝে মাঝে উপরের দিকে তাকিয়ে আকাশের রঙ দেখছিলাম।

বাজনা থেমে গেল। পিছনের লাল শালু সরিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করল একটি লোক। লোকটির পোশাক অনেকটা যাত্রাদলের আলিবাবার মতো। কালো রঙের মস্তবড় আলখাল্লা গায়ে। লোকটির মুখ অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে ঢাকা। কিন্তু গাম্ভীর্যের তলায় একটা মজা লুকনো আছে বলে আমার মনে হচ্ছিল।

সত্যিই লোকটির হাবভাব, চাল-চলনের নিচে একটা প্রচণ্ড মজা লুকনো ছিল। আমাদের চোখের সামনে লোকটি তার আলখাল্লা ঝেড়ে ঝেড়ে দেখাচ্ছিল যে আলখাল্লা ফাঁকা। তার ভিতরে কিছু নেই। আমরা দর্শকরাও নিশ্চিন্ত হলাম, সত্যিই কোনো কিছু নেই তার কাছে। দর্শকরা যখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘোষণা করল, না তার কাছে কিছু নেই, তখন সে হুম করে আলখাল্লার পকেট থেকে মস্ত বড়

একটা জ্যান্ত মুরগী বার করে আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরল। আমরা বিস্ময়ে এ-ওর দিকে তাকালাম। লোকটি সত্যিই সবাইকে একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়েছে। হাততালির শব্দে সমস্ত তাঁবু উদ্দাম হয়ে উঠল। তারপর সবাইকে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে জ্যান্ত মুরগী হাতে লোকটি পর্দার ভিতরে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কনসার্ট বেজে উঠল। আমরা পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। দর্শকদের চাপাগুঞ্জন বেশ একটা কোলাহলে পরিণত হয়েছে।

হঠাৎ আবার কনসার্ট থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কোলাহলও চুপসে গেল। আরও বেশি কিছু বিস্ময়ের জন্য দর্শকরা নিজেদের প্রস্তুত করে নিতে লাগল। আর ঠিক তখনই লাল শালুর পর্দা সরিয়ে নাচের পোশাকে একটি মেয়ে মঞ্চে প্রবেশ করল। আমার বেশ মনে আছে দর্শকদের মধ্যে থেকে ঘন ঘন সিটি পড়ছিল। আমি বুঝতে পারলাম, এই সেই সোনামুখী। যার রূপ বর্ণনায় মুগ্ধ হয়ে চাক্ষুষ দর্শনের অভিলাষে অনেকেই তাঁবুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে।

কনসার্ট বাজার সঙ্গে সঙ্গে সোনামুখী তার নাচ শুরু করল। প্রতিটি ভঙ্গিমায় যেন আদিমতা ফুটে ফুটে উঠছিল। আমার ভালো লাগছিল না। আমি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিলাম। নাচবার সময় মাঝে মাঝে সোনামুখীর ঘাগরা হাওয়ায় ফুলে উঠছিল, আর দর্শকরা উত্তেজনায় ফেটে পড়ছিল।

সোনামুখীর কাছ থেকে আমার দূরত্ব বড় জোর চার হাত হবে। মাঝে মাঝে ঝুমুর বাঁধা ওর নগ্ন পায়ের দিকে তাকিয়ে আমি ভয়ে কেমন যেন চুপসে যাচ্ছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, আমার জীবনে তখন এ ধরনের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। দর্শকদের উত্তেজনাকে ক্রমশ যেন চরম সীমায় পৌঁছে নিয়ে যাচ্ছিল সোনামুখী। আমি বিস্ময়ে একেবারে পাথর হয়ে গেলাম যখন দেখতে পেলাম সোনামুখীর পায়ের কাছে দর্শকরা পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে। সমস্ত আবহাওয়া তপ্ত আবেশে ভরে তুলে সোনামুখী তার নাচ থামাল।

তারপর সেলাম ঠোকার ভঙ্গিতে হঠাৎ করে লাল শালুর ভিতরে মিলিয়ে গেল। তীব্র কোলাহলে সমস্ত তাঁবু তখন উদ্দাম। আমার বেশ মনে আছে সেই হিংস্র আবহাওয়া থেকে বাঁচবার জন্যে আমি তাঁবুর উপরের দিকে তাকিয়ে আকাশের রঙ দেখেছিলাম।

তারপর কেন জানি না, পরের দিনও আমি একই রকমভাবে তাঁবুর ভিতরে ঢুকেছিলাম। এবং একই রকম উত্তেজিত আবহাওয়ায় ডুব দিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। শুধু পরদিন নয়। পর পর কয়েকদিন। কেমন যেন নেশা ধরে গিয়েছিল আমার। আর এই ভাবেই তাঁবুর বাইরে চোঙাফোঁকা সেই ক্লাউনটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে লোকটির নাম ছিল মোহন। মোহনের কাছে বসে আমি সোনামুখীর গল্প শুনেছিলাম। লাল শালুর ভিতরের জীবন মোহনই আমাকে চিনিয়ে দিয়েছিল।

হ্যাঁ, স্পষ্ট আমার মনে আছে সেই প্রথম দিনটির কথা। মোহনের পিছনে-পিছনে লাল-শালু ঢাকা জগতের ভিতরে আমি প্রবেশ করেছিলাম। ভয়ে এবং উত্তেজনায় সেদিন আমার সমস্ত শরীর কাঁপছিল। আমি কিছুতেই নিজেকে ঠিক রাখতে পারছিলাম না।

আমাকে নিয়ে যাওয়ার আগে মোহন আমাকে একটা শপথ করিয়ে নিয়েছিল। কেন, তখন, তা আমি কিছুতেই বুঝি নি। মোহন আমার সম্পর্কে যা-যা বলবে আমি তার যেন কোনো প্রতিবাদ না করি। আমি কোনো প্রতিবাদ করি নি। প্রতিবাদ করবার কোনো ক্ষমতাও আমার ছিল না তখন।

একটা সাদাসিধে ডুরে রঙের শাড়ি পরে সোনামুখী তখন রোদ্দুরে চুল শুকোচ্ছিল। এক নতুন রূপে যেন আমি তাকে দেখলাম। আর দেখেই কেমন যেন চমকে উঠলাম। দুষ্টু প্রজাপতির মতো আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল সোনামুখী। আর তখনই আমি দেখলাম তার ঝকঝকে সুন্দর দাঁত। আমার চোখের সামনে কে যেন একগুচ্ছ বেলকুঁড়ি মেলে ধরল।

আমার চোখের ভাষা বোধহয় মোহন বুঝল। আমার পিঠে একটা হাত দিয়ে সোনামুখীর দিকে তাকিয়ে বলল, দ্যাখ দ্যাখ কাকে এনেছি। তোকে একেবারে রাণী করে দিতে পারে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করল সোনামুখী। তারপর ফিক করে হেসে উঠে মোহনকে জিভ ভ্যাংচাল। আমার কি হল কে জানে? গাঁয়ের নতুন জামাইয়ের মতো আমিও সলজ্জভাবে হেসে উঠলাম।

আর তখনই আমি দেখতে পেলাম একটা মোটা-সোটা লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। পরনে চেকের লুঙ্গি, গায়ে ফতুয়া, মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, মধ্যিখানে রেললাইনের মতো একটা সোজা সিঁথি, চুল চুঁইয়ে-চুঁইয়ে কপালের কিছু অংশ তেলে চকচক করছে। লোকটিকে আমি চিনতে পারলাম। এই লোকটিই রোজ সন্ধ্যায় আলখাল্লা পরে ম্যাজিক দেখিয়ে দর্শকদের চিত্ত জয় করে।

মোহন কনুই দিয়ে আমাকে একটা ঠ্যালা মারল। আমি বুঝলাম, আমার সম্পর্কে মোহন যা-যা বলবে তার সব কথার এবার সায় দিতে হবে আমাকে। লোকটি আমাদের কাছাকাছি আসতেই মোহন গড় হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, আমাদের বড়বাবু। আমাদের মালিক, অন্নদাতা।

আমি দুই হাত তুলে নমস্কার করলাম।

তারপর লোক বশীভূত করবার সেই বক্তৃতার মতো মোহন গড়গড় করে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল। আমি অবাক হয়ে মোহনের কথাগুলো শুনছিলাম। মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে মোহন চোখ টিপছিল। যাতে আমি বেফাঁস কিছু না বলে বসি। আমি নাকি এক বিরাট বড়লোকের একমাত্র ছেলে। কলকাতা শহরে নাকি আমার সাতখানা বাড়ি। হুগলী জেলায় আমাদের মস্ত বড় জমিদারী আছে। সেখানে পূজোর সময় মেলা বসে। ছোট-খাটো মেলা।

তবে মোহনের সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে এবার নাকি আমি তাদের দলকে নিয়ে যেতে চাই। মোহন মোটামুটি আমাকে কথা দিয়েছে, সেটাও জানাল। ভদ্রলোক আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করছিলেন আর মোহনের কথাগুলো গিলে খাচ্ছিলেন। আমার বিশ্রী লাগছিল। মোহন কেন যে আমার সম্পর্কে এইসব গালভরা বুলি বলছে আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না। পরে অবশ্য বুঝেছিলাম। বুঝেছিলাম, তা না হলে লাল শালুর ভিতরে ঢুকবার অধিকার আমার জন্মাত না।

ভদ্রলোকের নাম বিষ্টুবাবু।

বিষ্টুবাবু সেদিন আর বেশি কথা বলেন নি। পাকা লোক চট্ করে আগ্রহ প্রকাশ করবার ব্যক্তি নন। যাচাই করে নিতে চান। একটি সিজার্স সিগারেট ধরিয়ে বিষ্টুবাবু শুধু সেদিন বলেছিলেন, আমরা তো আরও দিন দশেক আছি। পরে কথা বলা যাবে। তারপর সোনা-মুখীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, সোনামা, বাবুকে একটু চা খাইয়ে দাও। বলতে বলতে বিষ্টুবাবু তাঁবুর ভিতরে ঢুকে গিয়েছিলেন।

সেই দৃশ্যটি আমার চোখের সামনে আজও পরিষ্কার ভাসছে। অছিলা করে মোহন সরে গেছে। মাটিতে বসে সোনা চা করছে। মাথাভর্তি চুল। কোমর ছাড়িয়ে মাটিতে এসে লুটিয়ে পড়েছে। চুলের কিছু অংশ দুষ্টুমি করে মাঝে মাঝে চোখেমুখে আছাড় খাচ্ছে আর বিরক্তিতে দুষ্টু চুলগুলোকে পিছনের দিকে সরিয়ে দিচ্ছে সোনা। আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মাঝে মাঝে হাসছে সোনা। আর তখন তার গালে সুন্দর দুটো টোল পড়ছে।

সোনার সামনে, একটি মোড়ায় বসে আমার সমস্ত মনের মধ্যে আমি সোনার রূপ এঁকে নিচ্ছিলাম। সোনা আমার মনে নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল।

তারপর কতদিন আমি সোনার কাছে গিয়েছি। টুকরো টুকরো কত কথা হয়েছে। সব আজ আর মনে নেই। সোনার জীবনের কোনো কথা জানতে চাইলেই মোহিনী দৃষ্টি মেলে সোনা হেসেছে।

আর তখন ওর গালের টোল দুটো আমাকে কেমন উন্মনা করে তুলেছে।

মোহনের কথা সোনা বিশ্বাস করেছিল। আমি যে জমিদার-পুত্র বারবার নানা কথার ফাঁকে সোনা আমাকে স্মরণ করিতে দিত। আর সেইজন্যেই বোধহয় তার চোখেমুখে সব সময় একটা সম্ভ্রম জেগে থাকত। আমি বুঝতে পারতাম। বিশ্রী অস্বস্তি লাগত। কিন্তু কেন জানি না, কিছুতেই আমি আমার আসল পরিচয় সোনার কাছে প্রকাশ করতে পারতাম না।

তারপর সেদিনের কথা। আজও চোখ বন্ধ করলে আমি পরিষ্কার দেখিতে পাই। আর এত বছর পরেও কেমন যেন ভয়ে শিউরে উঠি।

শিয়ালদার একটা ছোট্ট রেস্তোরাঁয় বসে আমি আর মোহন চা খাচ্ছিলাম। চায়ের কাপে সবে চুমুক দিয়েছি, তখনই আমার হাত ধরে মোহন বলল, আপনি আর আসবেন না বাবু। আমি আপনার বাড়িতে দেখা করব।

আমি চমকে উঠলাম, কেন?

মোহন আমার হাত ধরেই বলল, বিষ্টুবাবু আপনার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছে। আমাকেই আপনার বাড়ি গিয়ে আপনার সত্যি পরিচয় যাচাই করে আসতে বলেছে।

আমি ভয়ে চুপসে গেলাম। অসহায়ভাবে মোহনের দিকে তাকিয়ে বললাম, তবে?

মোহন আমাকে ভরসা দিয়ে বলল, ভয় নেই। কাল সকালে আমি আপনার বাড়ি যাব।

আমি মোহনকেও যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না। বললাম, না, অন্য কোথাও দেখা কর।

মোহন হাসল। বলল, আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। ঠিক আছে।

তার পরের দিন সকালে কার্জন পার্কে আমি মোহনের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আর সেদিনই সোনার জীবনের পর্দা আমার চোখের সামনে থেকে খসিয়ে নিয়েছিল মোহন। দুঃখে-বেদনায়, ভয়ে-বিস্ময়ে আমি পাথর হয়ে গিয়েছিলাম।

আর সেদিনই আমি মোহনের নিজের মুখ থেকে শুনেছিলাম সোনা মোহনের নিজের মায়ের পেটের বোন, জীবিকার বন্ধনে ম্যাজিক দলের নর্তকী। যে-ব্যবসার আসল কর্তা বিষ্টুবাবু। বিষ্টুবাবুর মুখখানা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, কর্তৃত্বের কড়া দৃষ্টি মেলে সোনার দিকে তাকিয়ে আছেন বিষ্টুবাবু। ভয়ে বিষণ্ণতায় সোনা একেবারে চুপসে গেছে।

কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠছিল মোহন। মাঝে মাঝে আমার হাত চেপে ধরছিল। আমি দুটো পাথরের চোখ নিয়ে মোহনের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

মোহন আমার হাত ধরে বলছিল, আপনি যে করেই হোক কলকাতা শহরে আমার একটা চাকরি করে দিন। বিষ্টুবাবু একটা খুনী। আমার চোখের সামনে নিজের বোনের মৃত্যু দেখছি বাবু।

অদ্ভুত এক গম্ভীর পরিবেশ।

মোহনের চোখে চোখ রেখে আমি তাকাতে পারছিলাম না। ওর যন্ত্রণা বর্শার তীক্ষ্ণ ফলকের মতো আমার সর্বাঙ্গ বিদ্ধ করছিল। ভাইয়ের কর্তব্যের অক্ষমতার যন্ত্রণা। আমি লক্ষ্য করছিলাম, মাঝে-মাঝে ওর শরীরটা কেমন কেঁপে-কেঁপে উঠছিল।

আমি মোহনের কথা শুনছিলাম আর ভাবছিলাম, এই কি সেই পাড়াগাঁয়ের ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে সোনা! অল্পবয়সে যার মা মারা যায়। দাদার হাত ধরে সে সুন্দর সুখী জীবন গড়তে চেয়েছিল! আজ সে বিষ্টুবাবুর হাতের পুতুল।

নিজের অজান্তেই আমার শরীরের শিরা-উপশিরাগুলো কেমন

শক্ত-কঠিন হয়ে উঠছিল। বিষ্টুবাবুর মূর্তিখানা কেমন বীভৎস রূপ ধরে কাচের টুকরোর মতো আমার চোখের সামনে খানখান হয়ে ভেঙে পড়ছিল।

পরমুহূর্তেই নিজেকে কেমন অসহায় মনে হচ্ছিল। সদ্য কলেজ ছাড়া বেকার যুবক আমি। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। সামান্য টুইশানির উপর নিজের খরচ চলে। সমস্ত মানবিক আবেদনই যেন তার কাছে তুচ্ছ। মোহনের মতো একই অক্ষমতায় আমার ভেতরটা যেন আছাড় খাচ্ছিল।

মোহন চুপ করে ছিল। আর কিছু বলে নি। আর কিছু শোনার আগ্রহ সেদিন আমার ছিল না। আমি শুধু লক্ষ্য করেছিলাম, মোহনের দুই চোখের কোণে জল। মোহন কাঁদছিল।

তারপর মোহনকে আমার ঠিকানা দিয়ে সেদিন আমি উঠে পড়েছিলাম। বলেছিলাম, আমার সঙ্গে পরে দেখা কর মোহন।

তারপর একদিন, দু'দিন কেটে গেল। মোহন এল না। কেন ঠিক জানি না। হাজারো রকমের দুশ্চিন্তায় আমার মনটা ভারি হয়ে উঠতে লাগল। বারবার চোখের সামনে যন্ত্রণাকাতর ভাই মোহন আর বিষণ্ণতায় ঢাকা বোন সোনামুখীর মুখখানা ভেসে উঠতে লাগল।

মোহনের সেই যন্ত্রণা ধীরে ধীরে কেমন করে যে আমার সমস্ত দেহমনকে বশীভূত করল আমি ঠিক জানি না। দিনে রাতে সেই যন্ত্রণা আমাকে তাড়া করতে লাগল।

শিয়ালদার রথের মেলার সেই তাঁবু বারবার আমাকে টানতে লাগল।

পরক্ষণেই মনে হল আমি কে! আমি দর্শক, দর্শকই থাকি। অভিনেতা হওয়ার বাসনা আমার পরিত্যাগ করাই ভালো।

আমি যেতে পারি নি।

মোহন আসে নি। তবু আমি যেতে পারি নি।

কেন, আজও আমি জানি না। ঠিক তেমনি আমি জানি না

মোহন কেন আমার সঙ্গে দেখা করল না। বিষ্টুবাবুদের দল কলকাতায় রথের মেলায় আর কতদিন পসরা বসিয়েছিল আর সোনামুখীর ঘাঘরাওঠা নৃত্যচাঞ্চল্যে আরও কত দর্শক পয়সা ছুঁড়েছিল আমি জানি না।

কিন্তু সোনামুখীকে আমি আজও ভুলতে পারি নি। রথের মেলা বসলে আজও আমি থমকে দাঁড়াই। হারিয়ে যাওয়া একটি মুখ আমি খুঁজে বেড়াই।

এ-খোঁজার শেষ কবে!

সবিতা

'বিশ্বাস করো, সবসময় আমার নিজেকে কেমন অসহায় মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমি যেন আমার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলছি। কান পাতলেই আমি যেন অস্তিত্বের অবলুপ্তির শব্দ শুনতে পাই। সত্যিই, কেন জানি না, আমি কেমন যেন হারিয়ে যাচ্ছি। আলো, বাতাস, রোদ্দুর, অন্ধকার সবাই যেন আমাকে গ্রাস করে নিচ্ছে। বিশ্বাস করো, আমি একটুও বানিয়ে বলছি না। একটুও মিথ্যে বলছি না।' বলতে বলতে মেয়েটি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

কি জানি, সেই মুহূর্তে মনে হল মেয়েটির প্রতিটি কথা, যেন সে তার সমস্ত সত্তায় ডুবিয়ে-ডুবিয়ে বলছে। বিষণ্ণতার আত্মপ্রতিকৃতি আমাদের চোখের সামনে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অন্তত সেই মুহূর্তের জন্য তার যন্ত্রণার অংশীদার না হয়ে পারি নি। তার যন্ত্রণা যেন ভিমরুলের মতো আমাদেরও মস্তিষ্কের ভিতরে এসে আঘাত করছিল। আমরা কেউ বা রুমালে চোখ মুছছিলাম, আবার কেউ বা পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে চুপচাপ বসেছিলাম।

তারপর আলো জ্বলতে আমি লক্ষ্য করলাম সবারই চোখে-মুখে কেমন একটা বেদনার ছাপ। বিষণ্ণতার সমুদ্র থেকে সবাই যেন এইমাত্র স্নান করে উঠল।

পরে আরও অনেক ঘটনা ঘটে ছিল। শেষপর্যন্ত মেয়েটি আত্মহত্যা

করেছিল। আর আত্মহত্যা করবার আগে সে শেষবারের মতো ঘোষণা করেছিল, 'আমি মুক্তি চাই। এ বন্ধন আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমাকে মুক্তি দাও তোমরা।'

নাটকের একটি চরিত্র। অমলা। কিন্তু সেই মুহূর্তে একবারের জন্যও মনে হয় নি, আমি নাটক দেখছি। চরিত্রের সঙ্গে এমন সুন্দর মিশেগিয়েছিল মেয়েটি যে সে-যে প্রকৃত অমলা নয়, একথা ভাবতেও বিস্ময় জাগছিল। আর তাছাড়া, কি অদ্ভুত বাচনভঙ্গি, কি অপূর্ব অভিব্যক্তি। প্রতিটি অভিব্যক্তির কি অসামান্য ব্যঞ্জনা! দর্শকচিত্তকে জয় করবার অসাধারণ ক্ষমতা আছে মেয়েটির। তা সে যে-স্তরের দর্শকই হোক না কেন! হল ছেড়ে বেরিয়ে আসবার সময় অমলার সেই অসহায় বেদনার্ত মুখের ছবি আমার চোখের সামনে ভাসছিল; আমি সারা রাত শুধু ঐ একটি মুখের ছবিই দেখেছি। আমার বার বার মনে হয়েছে, সত্যিই আমরা কেউ ওকে বাঁচাতে পারি নি। আর যে মেয়েটির অভিনয় ক্ষমতা আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করছিল, সমস্ত সত্তাকে ভেঙ্গে দুমড়ে তছনছ করে দিচ্ছিল, মনে-মনে তাকে নমস্কার করেছি। মনে হয়েছে, কি অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারিণী মেয়েটি।

পরে মেয়েটির সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কারণ, যে-নাটকের মূল নায়িকা অমলার চরিত্রে অভিনয় করে মেয়েটি আমার সারা রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, তার পরিচালক ছিল আমার বন্ধু—অশোক।

অভিনয়ের কয়েকদিন পরের ঘটনা। হঠাৎ অশোকের সঙ্গে দেখা। দুই বন্ধু চায়ের দোকানে গিয়ে বসেছি। আকস্মিকভাবে অশোক প্রশ্ন করল, সেদিনের নাটক কেমন লাগল? অশোকের ধরনই ঐরকম। না-জানিয়ে, না-বুঝিয়ে আকস্মিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করে চলে।

অসাধারণ, মার্ভেলাস! চায়ে চুমুক দিতে দিতে আমি বললাম।

যা ফাজলামি ছাড়! সত্যি করে বল, কেমন লাগল? আমার বিশেষণ ব্যবহারকে ঠিক মতন নিতে পারল না অশোক।

আমি সোজা হয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বললাম, মাইরি, সত্যিই দারুণ ভাল লেগেছে।

অশোক বুঝল আমি হাল্কাভাবে কথা বলছি না। সে একটু নড়ে-চড়ে বসল।

আমি টেবিলে দুই হাত রেখে অশোকের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললাম, অমলার চরিত্রে যে অভিনয় করেছিল, ও মেয়েটি কে রে?

অশোক রহস্যের হাসি হাসল। তারপর একটা সিগারেট ধরাতে-ধরাতে আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে বলল, কেন?

বিশ্বাস কর, অসাধারণ অভিনয়ক্ষমতা মেয়েটির। মেয়েটির অভিনয় আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আমি সারা রাত ঘুমুতে পারি নি।

আমার বলার মধ্যে হয়তো একটু আবেগ ফুটে বেরিয়েছিল। ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে অশোক বলল, এদ্দুর!

আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম, ইয়ার্কি নয়। অসাধারণ, এক্সেপ-শানাল অভিনয় করেছে মেয়েটি। যখন বলছিল, অস্তিত্বের অবলুপ্তির শব্দ···

অশোক বাধা দিল, থাক। ওর সমস্ত ডায়লগ একেবারে মুখস্ত করে ফেলেছিস দেখছি। একটু থেমে আবার বলল, মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় করতে চাস?

আমি সোৎসাহে বললাম, আলবাৎ, একশবার। কবে পরিচয় করিয়ে দিবি বল?

সামনের সোমবার। আমাদের রিহার্সাল রুমে আসিস। তবে ভালোভাবে যদি পরিচয় করতে চাস, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

কতক্ষণ ?

ধরে নে, সারাজীবন।

বলাবাহুল্য দুই বন্ধু এক কথায় একই সঙ্গে হেসে উঠলাম।

যথারীতি সোমবারে আমি অশোকদের রিহার্সাল রুমে গিয়েছি। অশোক তার কথা রেখেছে। মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। তারপর কেন এবং কিভাবে ঠিক বলতে পারব না, মেয়েটি অর্থাৎ সবিতার সঙ্গে ধীরে-ধীরে আমি পরিচিত হয়ে উঠেছি। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে কেমন যেন কাছাকাছি এসে গেছি আমরা। সবিতাও আমার কাছে সহজ হয়ে উঠেছে।

তারপর একদিন রিহার্সাল শেষ হওয়ার পর অশোক আমাকে ডেকে বলল, হ্যাঁরে, বাড়ি ফেরার সময় তুই আজ একটু সবিতাকে পৌঁছে দিয়ে যাস।

অশোক হয়ত একটু যাচাই করে নিতে চাইছিল আমাকে। কিন্তু তার মনের ভাবকে আমি আমল দিলাম না। অবলীলাক্রমে বলে বসলাম, নিশ্চয়ই। এ আর এমন কি ?

সবিতা প্রতিবাদ করল, না, না থাক্। আমি একাই যেতে পারব। এই তো সামান্য পথ। কাছেই তো !

আমার কেমন যেন সম্মানে আঘাত লাগল। বললাম, না, তা হয় না। অবশ্য আপনার যদি কোনো আপত্তি থাকে তবে থাক। কথাটি বলে আমি সবিতার চোখের ভাব লক্ষ্য করবার চেষ্টা করলাম।

সামান্য একটু সময়। কি যেন ভাবল সবিতা। তারপর আস্তে আস্তে বলল না, তা ঠিক নয়। তবে—বলে বিনুনির ডগা হাতের আঙুলে পাকাতে লাগল।

অশোক লক্ষ্য করছিল ব্যাপারটা। আমার পিঠে একটা প্রচণ্ড থাপ্পড় মেরে বলল, ও সব ভনিতা থাক। ফেরার সময় সবিতাকে পৌঁছে দে।

কেউ কোনো কথা না বলে দু'জনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। তারপর পথে বেরিয়ে মুখে কোনো কথা নেই। দু'টি বোবা মানুষ যেন পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। এবং বেশ দূরত্ব বাঁচিয়ে।

আমিই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলাম। কি, এরকম চুপ করে গেলেন কেন?

না, এমনি! ভয়ানক ক্লান্ত লাগছে।

সত্যিই! আমি সমবেদনা প্রকাশ করলাম।

তারপর সবিতা কথা পাড়ল। আপনি অভিনয় করেন না কেন?

পারি না বলে! আমি সোজা জবাব দিলাম।

পারেন না আবার কি? আমিও কি পারতাম নাকি? সবিতা বলল।

পারতেন কিনা জানি না। তবে এখন আপনি যা অভিনয় করেন, তার কোনো তুলনা হয় না। আমি বললাম।

আমার চোখের সামনে সবিতার সেদিনকার অভিনয়দৃশ্য ভেসে উঠল। সেদিন থেকে মনে মনে আমি সবিতাকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছি, অন্তত তার অভিনয় ক্ষমতার।

সবিতা কোনো কথা বলল না। চুপচাপ হাঁটতে থাকল। প্রশংসা শুনলে মেয়েরা বোধহয় একটু লজ্জা পায়।

হাঁটতে-হাঁটতে আমরা লেক ছাড়িয়ে যাদবপুরের দিকে এসে পড়েছিলাম। সবিতা হঠাৎ বলল, আপনি যান। এটুকু আমি একা চলে যেতে পারব। বলতে বলতে হঠাৎ সরু পথের দিকে পা বাড়াল সবিতা। আমি বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। বুঝতে পারলাম না এখানে সবিতা কোথায় থাকতে পারে। আমার চোখের সামনে থেকে সবিতা আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেল।

বেশ কিছুদিন পরের কথা।

অশোকদের রিহার্সাল রুমে আর যেতে পারি নি। নানারকম কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। বাইরের জগৎ থেকে সাময়িকভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আনতে বাধ্য হয়েছি।

সেদিন ঢাকুরিয়ায় এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। ফেরবার সময় যাদবপুরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিলাম তার সঙ্গে। সিগারেটের ধোঁয়ায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে হাঁটছি। কিন্তু হঠাৎ যেন আমি চমকে উঠলাম। এমন একটা মূর্তি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, যাকে এখানে দেখব আমি আশা করি নি। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার বন্ধু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না। আমাকে একটা ঠ্যালা দিয়ে বলল, কি হল ?

আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম। সবিতা যে এখানে থাকে একথা ভাবতে আমার একদম ইচ্ছে করছিল না। ভালো লাগছিল না। কেন, ঠিক জানি না।

পথের ওপাশে বাস্তুহারাদের ছোট-ছোট যে আস্তানা গড়ে উঠেছে সেখান থেকে উন্মুক্ত আলোয় ঠিক অরণ্যকুমারীর মতো বেরিয়ে আসছিল সবিতা। চোখে-মুখে ঘুমের জড়তা। কি জানি আমার মনে হল, আমার সরে যাওয়া দরকার। এখানে, আমাকে সবিতার না দেখাই ভালো।

কিন্তু আমার ভাবনা সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার আগে সবিতা সোজা আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। নিজের অজান্তেই মুখে হাসি ফুটিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম। বন্ধুটি কোনো কিছুই ঠিকমত বুঝতে না পেরে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে মাটির পুতুলের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

আমাকে কিছু বলবার অবসর না দিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে সবিতা বলল, কি ব্যাপার, প্রাতর্ভ্রমণ করছেন নাকি ?

আমার চোখের বিস্ময় বোধহয় সবিতা বুঝতে পারল। সামনের আস্তানাগুলোর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, এই তো, এখানেই আমি থাকি।

আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম কথাকটি বলবার সময় একবারের জন্যও সবিতার চোখে-মুখে কোনো রকম লজ্জা বা জড়তা ফুটে উঠল না। যেমন সহজভাবে সে আমার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি সহজ ভাবে কথাকটি বলে গেল সে।

আমি ভদ্রতার হাসি হাসলাম, তাই নাকি? এই জন্যে সেদিন রাস্তা থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন। আমি তো ভাবলাম···আমি কথা শেষ করতে পারলাম না। নিজের কথায় নিজেই লজ্জা পেয়ে গেলাম।

কি ভাবলেন? কোনো বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে আগে থেকে মিট করার কথা ছিল—তাই তো? ঠাট্টার সুরে বলল সবিতা।

আমার নিজেকে বড় অসভ্য মনে হল। সত্যি ভেবেচিন্তে কথা না বলার এমন খারাপ অভ্যাস আমার!

কিন্তু সবিতা কিছু মনে করেছে বলে মনে হল না। কণ্ঠে একই রকম ঠাট্টা ঢেলে সে বলল, না মশাই, এখানেই আমি থাকি।

লজ্জায় আমি একেবারে চুপসে গেলাম।

সবিতা আবার মুখ খুলল, যাকগে, কি হয়েছে আপনার, ওদিকে আর আসেন না কেন?

পারিবারিক ব্যাপারে হঠাৎ একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। লজ্জা কাটিয়ে উঠে আমি জবাব দিলাম।

ও! বলে একটু চুপ করল সবিতা। তারপর খেলার ছলে চোখেমুখে ছড়িয়ে পড়া চুলগুলোকে ঠিক করতে করতে বলল, সামনের রবিবার ফ্রি আছেন?

থাকতে পারি। কেন?

তাহলে আমাদের অভিনয় দেখতে আসুন।—বলে সে জায়গাটা জানাল।

কি ব্যাপার? আপনার নতুন কোনো অভিনয় আছে নাকি?

হ্যাঁ। ছোট্ট জবাব দিল সবিতা।

কি বই?

আগে বলা বারণ।

তাই নাকি ?

নিশ্চয়।

আমরা দু'জনেই হেসে উঠলাম। বন্ধুটির এতক্ষণে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। গলা ঝেড়ে সে-কথা সে জানান দিল। স্বাভাবিক। আমি সবিতাকে বিদায় দিলাম। আসার সময় ছোট্ট করে বলে আসলাম, রবিবার চেষ্টা করব। আকাশের মতো চোখ মেলে সবিতা আমার দিকে তাকাল। কোনো কথা বলল না। ঠোঁটের কোণে শুধু একটু ছোট্ট হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলল।

আমি ফিরে আসতে বন্ধুটি হৈ হৈ করে উঠল, কি ব্যাপার বল তো ?

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে গম্ভীরভাবে জবাব দিলাম, কই, কিছু নয় তো !

মানে ? বন্ধুটি অধৈর্য হয়ে উঠল।

আমি আড়চোখে বন্ধুর দিকে তাকালাম। ওর কৌতূহলে আমার খুব মজা লাগছিল। মুখের মাঝে একরাশ ধোঁয়া টেনে নিয়ে আমি রিং করে করে ছাড়তে লাগলাম।

বন্ধুটি কৌতূহল আর চাপতে পারল না, মেয়েটি কে ?

সবিতা।

বন্ধুটি ভ্রূ কোঁচকাল। সবিতা ! সে আবার কে ?

মেয়েটি। আমি ইচ্ছে করেই ওকে চটাতে চাইলাম।

ও সত্যিই চটে গেল, ইয়ার্কি ছাড়। মেয়েটি কে ?

আমি সামান্য একটু সুতো ছাড়লাম। বললাম, অভিনয় করে।

অভিনয় করে ? কেমন যেন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বলল বন্ধুটি, অভিনয় করার সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক ?

আমি অভিনয় দেখতে ভালোবাসি।

তা অভিনয় ভালোবাসার সঙ্গে পরিচয়ের কি সম্পর্ক আছে ?

আমি অভিনয়ের গভীরে যেতে চাই।

ও, বলে চুপ করল বন্ধুটি। আমি বুঝলাম, ও ভীষণ রেগে গেছে। কেন জানি না, ও যতই রেগে উঠছিল, ততই যেন ওকে রাগাতে ইচ্ছে করছিল আমার।

কিন্তু আমার সমস্ত ইচ্ছে একেবারে পাথর হয়ে গেল যখন ও দুম্ করে বলে বসল, এদের সঙ্গে বেশি মেশা কিন্তু ঠিক নয়।

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার রক্ত রেসের ঘোড়ার মতো কেমন টগবগ করে নেচে উঠল। এ-জাতীয় কথা ও বলবে আমি কল্পনা করতে পারি নি।

আমার চোখের ভাব বোধহয় লক্ষ্য করল বন্ধুটি। আরও জোর দিয়ে আমাকে বোঝাতে চাইল, বিশ্বাস কর, আমি ভালো করে জানি। আমি ঠিকই বলছি।

আমি কঠিন স্বরে বললাম, এসব নোংরা কথার মধ্যে আমি যেতে চাই না। যাকে আমিও ভালো করে চিনি না, তুমিও চেন বলে মনে হল না, তাকে নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো বোধহয়।

তুই আমাকে ভুল বুঝছিস। বন্ধুটি প্রতিবাদ করল।

বাকি পথটুকু আমরা কেউ কোনো কথা বলি নি। দুজন যেন দুটি ভিন্ন জগতের মানুষ।

রবিবারের সন্ধ্যাটা আমি নষ্ট করতে চাই নি। নির্ধারিত হল-এ গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে'র নাট্যরূপ। বিমলার চরিত্রে অভিনয় করেছিল সবিতা। বিমলা আমার ছেলেবেলা থেকেই প্রিয় চরিত্র। কিন্তু এমন জীবন্ত রূপ আমি কোনোদিন কল্পনাতেও আঁকতে পারি নি। সন্দীপের সঙ্গে যখন বিমলা তার দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসার কথা বলছিল, তখন চোখের কোণে দাউ দাউ করে যেন আগুনের শিখা জ্বলছিল। বিষণ্ণতার সাগরে সন্থ

স্নান করে ওঠা অমলা, আর আগুনের ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত বিমলা—দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চরিত্র। কোনোরকমভাবেই এদের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু কি আশ্চর্যভাবে ভিন্নধর্মী দুটি চরিত্রকে দর্শকদের মাঝে জীবন্ত করে তুলল সবিতা। বিস্ময়ে-আনন্দে আমি নিশ্চল হয়ে উঠেছিলাম।

অভিনয় শেষে আমি বাড়ি ফিরে এলাম। আমার মনে হল, মামুলী অভিনন্দন জানাবার অনেক উর্ধে সবিতা।

পরের দিন আমি নিজের থেকেই সবিতাদের বাড়ি গেলাম। ঠিক কোন বাড়িটা না জানলেও জায়গাটা সেদিন আমার চেনা হয়ে গিয়েছিল।

পথের মাঝে একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করছিল। কুকুরকে আমার ভীষণ ভয়। তাই বেড়ার বাঁশ ধরে চোখ দিয়ে খোঁজার চেষ্টা করছিলাম কোথায় সবিতাদের বাড়ি হতে পারে।

একটি বছর দশেকের ছেলে হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। আমার কুকুর-ভীতি ছেলেটি বুঝল। কুকুরটিকে তাড়িয়ে দিয়ে আমাকে জিগ্যেস করল, কাকে চান?

আমি সবিতার নাম বললাম। ছেলেটি খুব আপ্যায়ন করে আমাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে গেল। আপ্যায়নের অর্থ পরে বুঝেছিলাম। অভিনয়ের জন্যে সবিতার সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশ্যে অনেকেই এখানে আসেন। ছেলেটি সেরকমেরই কিছু মনে করেছিল আমার বিষয়ে।

আমাকে দেখে সবিতা একটু অবাক হয়েছে মনে হল। কিন্তু মুহূর্তের জন্য। তারপর শাড়িতে হাত মুছতে মুছতে আমার কাছে এগিয়ে এসে সহজভাবে বললে, কি সৌভাগ্য, আপনি এসেছেন।

মামুলী ভদ্রতা, আমার কেমন যেন লাগল। বললাম, কেন, আসতে নেই?

না, তা বলি নি। নিন বসুন। বলতে বলতে সামনের উঠোন থেকে এনে একটা ভাঙা চেয়ার আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি

অবাক চোখে সবিতার দিকে তাকিয়েছিলাম। কেমন যেন অন্যরকম লাগছিল সবিতাকে। পরনে একটি কম দামের লাল-পেড়ে শাড়ি, খালি পা, চুল খোলা, কপালে মস্তবড় টিপ। চিবুকে আর ঠোঁটের কোণে ছোট ছোট ঘামের বিন্দু জমে আরও যেন সুন্দর লাগছিল।

কয়েক হাত দূরে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে বিড়ি টানছিলেন। হাওয়ায় বিড়ির গন্ধ মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল। ভদ্রলোকের খালি গা। গায়ের রং রোদে-পোড়া তামাটে। এককালে ফর্সা ছিলেন মনে হয়। বুকের হাড়গুলো বেরিয়ে এসেছে।

একটি সুন্দর মেয়ে মুহূর্তের জন্য উঁকি মেরে আবার মুখ সরিয়ে নিল। সবিতার সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে মেয়েটির।

বিস্ময়ভরা চোখে আমি সবাইকে দেখছিলাম। সবিতা ইশারায় বুঝিয়ে দিল, আমার বাবা, আমার ছোট বোন। তারপর কি জানি কি ভেবে বলল, চলুন বাদামতলায় গিয়ে বসা যাক। এখানে বসে কখনো কথা বলা যায়!

আমি উঠে পড়লাম। সবিতা আগে আগে চলল। একই পোশাকে। খালি পায়ে। খোলা চুলে।

একটু দূরে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় একটা বাদামগাছ, তার নিচে বাঁশের মাচা বাঁধা। সামনে একটি ছোট পুকুর। অবসর-যাপনের বারোয়ারী ব্যবস্থা বুঝি এখানেই। ছু-একটা বাচ্চা ছেলে এদিকে-ওদিকে খেলছিল। আমরা গিয়ে সেই মাচারই এক পাশে বসলাম।

সবিতা কথা বলছিল। আর আমি অবাক হয়ে তার প্রতিটি বলার ভঙ্গি, প্রতিটি কথা অনুভব করবার চেষ্টা করছিলাম। সবিতা কেন যে তার জীবন-কাহিনীর পাতা আমার সামনে মেলে ধরল, তা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমার মনে হল, এ যেন সেদিনের মঞ্চের অমলা আর বিমলার মিশ্র চরিত্রে অভিনয় করছে সবিতা। একদিকে বিষণ্ণতা, আর অন্যদিকে অস্তিত্ব রক্ষার তীব্র প্রতিজ্ঞা।

সবিতা অভিনয় জগতে আসবে কোনোদিন কল্পনাও করে নি।

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার। সাধারণ লেখাপড়া শিখে স্বামীর সংসার করাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু যেদিন তাদের খড়কুটোর মতো ছিট্‌কে এসে কলকাতার শহরতলীতে অস্থায়ী আস্তানা গড়তে হয়েছিল, হাঁপানীর রুগী বৃদ্ধ বাবা যেদিন অসহায় হয়ে গালে হাত দিয়ে বসেছিলেন, সেদিন থেকেই সবিতা বুঝেছিল তার জীবনের ধারা অন্যদিকে বইতে শুরু করেছে। বাড়ির বড় মেয়ে সবিতা সেদিন অসহায়তাকে অস্বীকার করে মাটিতে শক্ত পা ফেলে ফেলে হাঁটবার চেষ্টা করেছিল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে অন্য এক জগৎ অর্থাৎ অভিনয়-জগতে এসে আটকে গেছে সবিতা। সে-জগতে তার অন্য পরিচয়। সেই পরিচয়ের সূত্রেই আজ আমি এখানে এসেছি। এই পরিচয়ে মনে মনে তাকে শ্রদ্ধা করতেও শিখেছি।

কিছুক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল সবিতা, যাকগে, বাদ দিন। আপনার কি খবর বলুন! নিজের কথা বলতে পারলে কেউ আর থামতে চায় না।

সবিতার বিষণ্ণতা তখন আমাকেও আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আমি করুণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললাম, একটা কথা জিগ্যেস করব, কিছু মনে করবেন না।

সবিতা হাসল। বলল, বলুন।

আচ্ছা, আপনি কিরকম পান এতে এখন?

সবিতা একটা ছোট্ট ঢিল তুলে পুকুরের জলে ছুঁড়ে মারল। জল কেঁপে কেঁপে অজস্র রিং তৈরি হতে লাগল। সেই মুহূর্তে আমার অসম্ভব ছেলেমানুষ মনে হল সবিতাকে। জলের রিংগুলোর দিকে তাকিয়ে সবিতা, পাল্টা প্রশ্ন করল, আপনার কত মনে হয়?

আমি হাসলাম, কি করে জানব?

জলের ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে থেকেই সবিতা বলল, এখন যে খুব খারাপ হয় তা নয়। যে-কোনো অভিনয়েই আমি একশ' টাকা করে

পাই। তবে, আমার আসল সুনাম অফিস ক্লাবে। আমাকে এখন ওঁরা দু'শো টাকা করে দেন। অবশ্য রিহার্সাল সমেত।

এরকম ক'টা অভিনয় এখন মাসে করেন? আমি আবার জিগ্যেস করলাম।

সবিতা একটু ভাববার চেষ্টা করল। তারপর বলল, মাসে তিন-চারটে। তবে, সব মাসে তো সমান যায় না। গড়ে মাসে বোধহয় দু'টো পড়ে।

ও! আমি চুপ করলাম।

সবিতা একটু হাসল। তারপর বলল, জানেন, এখন তো আমার একটু নাম হয়েছে। প্রথমে আমাকে দিয়েছিল মাত্র কুড়ি টাকা। তখন আমি নতুন। অভিনয়ের অ-আ-ক-খ-ও বুঝি না। আর তাছাড়া কতরকম শুভানুধ্যায়ীর পাল্লাতেই না পড়েছি। এখন তো অনেক বড় হয়েছি। তখন তো একেবারে এইটুকু ছিলাম!

মানে? হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সবিতা খিল খিল করে হেসে উঠল। আপনি একেবারে ছেলে-মানুষ দেখছি। শুধু কি অভিনয়ের সুযোগ, আমার ভবিষ্যৎ গড়ে দেওয়ার মহান দায়িত্ব যে কত লোক নিতে চেয়েছে!

আমি হাসলাম। ও। তাই নাকি? তা সে-সব মহাপুরুষেরা কোথায়?

অন্ধকারের জীব অন্ধকারেই আছে হয়তো কোথাও, সবিতা বলল, তবে এ-কথা আমি জোর দিয়েই বলব, সংসারে ভালোমানুষের সংখ্যাই অনেক—অনেক বেশি। আর সত্যিকারের নাটকপ্রিয় লোক এ-জগতে যথেষ্ট। বরং তাঁদের সংখ্যাই এখন বাড়ছে। নতুন-নতুন নাটক তাঁরা করছেন। সেখানে অভিনয় করে সত্যি আমার খুব আনন্দ লাগে। এখন বুঝতে পারি, গোপনে-গোপনে সত্যিই আমি অভিনয়কে ভালোবেসে ফেলেছি।

সবিতা চুপ করল। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলুন, বেলা হয়ে যাচ্ছে, যাওয়া যাক।

আমি উঠে পড়লাম। সবিতাকে বিদায় দিলাম। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, পায়রার খুপরির মতো তার সেই ছোট্ট আস্তানায় আস্তে আস্তে ঢুকে যাচ্ছে সবিতা।

সাধারণ, খুবই সাধারণ একটি মেয়ে। কিন্তু শিল্পবোধ তাকে করেছে শ্রীময়ী, আর জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে দিয়েছে ব্যক্তিত্ব। তার চলার ভঙ্গিতে, প্রতি পদক্ষেপে সেই নতুন ব্যক্তিত্বের ছাপ যেন স্পষ্ট ফুটে উঠছে।

মণিমালা

মণিমালা আমাকে একেবারে অবাক করে দিয়েছে। নানারকম ওজর-আপত্তি তুলে কাল এড়াবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আজ তার কোনোরকম পুনরাবৃত্তি করবার উপায় নেই আমার।

একগাদা প্রুফ দেখে মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে মাথাটাকে একটু পরিষ্কার করে নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম, এমন সময় মণিমালা এসে হাজির। সোজা আমার টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে জিগ্যেস করল, কম্পোজিটর রাখবেন?

অবাক চোখে আমি মণিমালার দিকে তাকালাম। কত আর বয়স হবে। বড়জোর বছর কুড়ি। চোখে-মুখে দারিদ্র্যের ছাপ। ঘামে-ভেজা শরীর। কপালে ঘাম জমে-জমে বড় বেশি ক্লান্ত দেখাচ্ছিল ওকে।

আমি সামনের চেয়ার দেখিয়ে বললাম, বসুন।

সামান্য একটু ইতস্তত করল মণিমালা। আমি আবার বললাম, বসুন, কথা বলছি।

মণিমালা বসল। তারপর শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে আমার দিকে তাকাল। আর তখনই আমি লক্ষ্য করলাম, মণিমালার চোখ দুটি ভারী উজ্জ্বল। চোখের দৃষ্টিতে কিরকম যেন অদ্ভুত স্বপ্ন মাখানো।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে কি ভাবল কে জানে। অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল মণিমালা।

আমি কথা বললাম, দেখুন, কম্পোজিটরের কাজ কি আপনি পারবেন? আমার মনে সন্দেহ ছিল মেয়েদের পক্ষে কম্পোজিটরের কাজ করা সম্ভব কিনা! আমি আগেই অবশ্য জানতাম কিছু কিছু মেয়ে কম্পোজিং-এর কাজ নিয়ে এ লাইনে আসছে। তবুও কেমন সন্দেহ ছিল আমার।

টেবিলের উপর একটা হাত রাখল মণিমালা। আমি লক্ষ্য করলাম ওর হাতে মাত্র একগোছা কাঁচের চুড়ি।

কি যেন একটু ভাবল মণিমালা। তারপর বলল, আপনি ট্রায়াল দিয়ে দেখুন। না পারি রাখবেন না।

ট্রায়াল দেওয়ার আগে তবু আমি কিছুটা নিশ্চিত হতে চাইলাম, আট ঘণ্টায় চব্বিশ এম কতটা কম্পোজ করতে পারেন? স্মল পাইকায়?

মণিমালা হাসল, কতটা আপনি চান?

কমপক্ষে একশ' দশ লাইন। আমি জবাব দিলাম।

দেখুন না ট্রায়াল দিয়ে। বেশ জোরের সঙ্গেই কথাটি বলল মণিমালা। আমি একটু বিস্মিত হয়ে ভাবলাম, বলে কি!

তবু শেষবারের মতো আমি অন্য একটা আপত্তি তুলবার চেষ্টা করলাম। কি জানি আমার বারবার মনে হচ্ছিল মেয়েদের পক্ষে সঠিক ভাবে এ কাজ করা সম্ভব হবে না। হয়তো আমার সংস্কার। হয়তো আমার মানসিকতা।

আমার এখানে তো সবাই ছেলে। তার মধ্যে কাজ করতে আপনার খুবই অসুবিধা হবে, আমি বললাম।

কেন? মণিমালা সহজভাবে প্রশ্ন করল।

আপনি তো একা। সবই তো বোঝেন, কত রকমের অসুবিধা হতে পারে।

না। তা হবে কেন? আগে যেখানে কাজ করতাম, সেখানেও তো একা ছিলাম। কোনোরকম অসুবিধা হয় নি।

স্বাভাবিক কৌতূহলবশে প্রশ্ন করলাম, তা সেখানকার চাকরি ছাড়লেন কেন?

অন্য কোনো কারণে নয়। সেখানকার মালিক বেশ ভালো লোক ছিলেন। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তবে, ঠিক মতো মাইনে দিতে পারতেন না। মাসে চার-পাঁচ বারেও ঠিক মতো মাইনে শোধ করতে পারতেন না।

তা, কত মাইনে পেতেন ওখানে?

আশি টাকা।

এখানে কত চান?

আগে কাজ দেখুন আমার। তারপর আপনিই ঠিক করে দেবেন।

আর আপত্তি চলে না। হেড কম্পোজিটরকে ডেকে বুঝিয়ে দিলাম, কাল এঁকে ট্রায়াল নিন।

মণিমালা উঠে দাঁড়াল, কাল তাহলে কখন আসব?

বললাম, দশটায়।

নমস্কার করে মণিমালা বেরিয়ে গেল।

হেড কম্পোজিটর তারাপদবাবু। আমার পুরনো লোক। বলতে গেলে প্রেসের জন্ম থেকেই আছেন। প্রেসের অনেক ব্যাপারে আমি ওঁর উপর নির্ভরশীল। নতুন কোনো লোক নিয়োগ করবার আগে সাধারণত আমি ওঁর সঙ্গে আলোচনা করে থাকি। আমি লক্ষ্য করলাম, তারাপদবাবু ব্যাপারটা ঠিক ভালোভাবে নিতে পারেন নি। কি যেন বলতে চাইছেন।

জিগ্যেস করলাম, কিছু বলবেন?

চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে তারাপদবাবু বললেন, মেয়ে রাখবেন ?

কেন ? আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম।

না, তবে, মানে—তারাপদবাবু আমতা আমতা করতে লাগলেন।

কি হল বলুন, কি বলতে চান। আমি বিরক্তিবোধ করলাম।

মেয়েরা কি পারবে ? তাছাড়া সব ছেলের মধ্যে একটি মাত্র মেয়ে। তারাপদবাবু পরিষ্কার করেই তাঁর আপত্তির কথা জানালেন।

আমি হেসে উঠলাম, আমিও তো তাই ভেবেছি। সবই খুলে বলেছি মেয়েটিকে। কিন্তু নাছোড়বান্দা। যাকগে কাল ট্রায়াল দিয়ে দেখুন না। আমার মনে হয়, আমি যা চাই, সে রকম কাজ ও কিছুতেই করতে পারবে না।

আচ্ছা ঠিক আছে। তারাপদবাবু চলে গেলেন। আমার মনে হল, আমার কথাতে তারাপদবাবু ঠিকমত সায় দিতে পারলেন না। মনের মধ্যে একটা কিন্তু রয়ে গেছে।

কিন্তু পরের দিন ট্রায়াল দিয়ে সত্যিই আমাকে অবাক করে দিল মণিমালা। আমি একা কেন, তারাপদবাবুও বিস্মিত হয়ে গেলেন। তারাপদবাবুই আমার কছে কাজের রিপোর্ট নিয়ে এসে খবরটি দিলেন, এই নিন প্রুফ। কত লাইন কম্পোজ করেছে জানেন ?

কত আর হবে ? আমি তাচ্ছিল্যের সুরে বললাম।

একশো চল্লিশ লাইন, চব্বিশ-এম স্মলপাইকা, বলে তারাপদবাবু আমার দিকে তাকালেন। আমি অবাক হয়ে বলে উঠলাম, বলেন কি ? দেখি দেখি ভুল কি রকম আছে ?

কিন্তু আশ্চর্য ! পুরো এক গেলি প্রুফে সামান্যই ভুল বার করতে পারলাম। এত ভালো কম্পোজ সচরাচর খুব কম চোখে পড়ে। আমার সমস্ত পুরনো ধারণাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে মণিমালা।

আমি কেমন যেন মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠছিলাম। বললাম, ডাকুন ওকে এখানে।

মণিমালা এসে দাঁড়াল।

আমি প্রায় অভিনন্দনের সুরে বলে বসলাম, দারুণ কাজ করেছেন আপনি। এত ভালো কাজ করবেন আমি আশাই করি নি। আপনার মতো কম্পোজিটর যে-কোনো প্রেসের পক্ষে একটা সম্পদ।

উৎসাহের তোড়ে আমি হয়তো আরও অনেক কথা বলতাম। কিন্তু মণিমালা আমাকে থামিয়ে দিল, আমি কি কাল থেকে আসব ?

নিশ্চয়। কাল দশটায় আপনি জয়েন করবেন।

আচ্ছা, বলে নমস্কার করে মণিমালা বেরিয়ে যেতে চাইল।

আমি ডাকলাম, কই মাইনে ঠিক করে গেলেন না ?

মণিমালা ঘুরে দাঁড়াল, ও আপনি যা হয় ঠিক করবেন।

তা কি হয়। আপনি ঠিক করে যান।

মণিমালা হাসল, আপনি কি আমাকে কম দেবেন ?

অতটা বিশ্বাস আমি গ্রহণ করতে চাইলাম না। বললাম, এখন আপনি একশ' টাকা পাবেন। পরে বাড়িয়ে দেব।

মণিমালা কেমন যেন থমকে গেল। এতটা ঠিক ও আশা করে নি। আমি একেবারে কুড়ি টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেব ও একেবারেই ভাবতে পারে নি। উজ্জ্বল ছুটি চোখ তুলে ও আমার দিকে তাকাল

আমি বললাম, কিছু বলবেন ?

মণিমালা বলল, না। তারপর আরও প্রায় মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে আবার নমস্কার করে বেরিয়ে গেল। আমি ঠিক ওর মনের ভাব বুঝতে পারলাম। কি জানি আমার মনে হচ্ছিল, কিছু একটা বলতে চেয়েও বলতে পারল না মণিমালা।

তারাপদবাবুর দিকে তাকিয়ে বললাম, কি, খুশি ?

তারাপদবাবু শুধু তৃপ্তির হাসি হাসলেন। অনেক বছর কম্পোজিং

লাইনে আছেন তারাপদবাবু। তাঁকেও বোধহয় আমার চেয়ে বেশি অবাক করে দিয়েছিল মণিমালা।

এর পর অনেক দিন কেটে গিয়েছে। মণিমালাকে নিয়ে কম্পোজিটরদের মধ্যে যে চাপা গুঞ্জন ছিল তার আর কোনো লক্ষণ নেই আজ। মণিমালাকে সবাই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেকে তার কাজের তারিফ না করে পারে নি।

মণিমালার ব্যবহারও সবাইকে মুগ্ধ করেছে। অমায়িক মিষ্টি ব্যবহার, আস্তে আস্তে কথা বলে। কথা বলার সময় ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি যে-কোনো লোককেই মুগ্ধ করে।

আমি তবু প্রায়ই মণিমালাকে জিগ্যেস করি, কেনো অসুবিধা হচ্ছে না তো? হলেই অমাকে বলো।

মণিমালা ঠোঁটের কোণে স্বাভাবিক হাসি ফুটিয়ে বলে, না অসুবিধা কি। সবাই আমাকে খুব সাহায্য করেন।

আমার সঙ্গেও অনেকটা আন্তরিক হয়ে উঠেছে মণিমালা। আপনি থেকে তুমি সম্বোধনে নেমে এসেছি। মণিমালাই জোর করেছে।

চাকরিতে ঢোকার দু-চার দিন পরে হঠাৎ আমাকে এসে বলল, আপনি আমাকে নাম ধরে ডাকবেন। আমি আপনার ছোট বোনের মতো। আমাকে আপনি বললে আমার ভয়ানক লজ্জা করে।

আমি হাসলাম, আচ্ছা।

সেদিন আমি কথায় কথায় মণিমালার পারিবারিক ইতিহাস কিছু জেনে নিয়েছিলাম।

ঘর ফাঁকা ছিল। প্রথম দিনের মতো সামনের চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে মণিমালাকে বললান, বসো।

মণিমালা সঙ্কোচ না করে বসে পড়ল।

জিগ্যেস করলাম, তোমার বাড়িতে কে আছেন ?

মণিমালা সহজভাবে জবাব দিল, বাবা, মা আর ছোট ভাই।

বাবা কি করেন ?

বাবাও কম্পোজিটর ছিলেন। এখন বুড়ো হয়েছেন। চোখে দেখতে পান না ভালো করে।

তুমি কি বাবার কাছে কাজ শিখেছ ?

না।

তবে ?

বাবার আপত্তি ছিল আমি কম্পোজিং-এর কাজ শিখি। বাবা বলতেন, কম্পোজিটরের কাজ করে করেই তাঁর চোখের এই দশা। আমার মামাতো ভাইও কম্পোজিটর। সেই আমাকে একটা প্রেসে কাজ শিখবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

কতদিন তুমি কাজ শিখেছ ?

বছর তিনেক হবে।

তিন বছরে তো খুব ভালো কাজ শিখেছ !

মণিমালা হাসল।

তাহলে তোমার উপরই সমস্ত সংসার নির্ভরশীল ?—আমি প্রশ্ন করলাম।

মণিমালা ছোট্ট জবাব দিল, হ্যাঁ।

তুমি কতদূর পর্যন্ত পড়েছিলে ?

নাইনে উঠেছিলাম। তারপরই তো কাজ শিখতে গেলাম। বাবা তখন প্রায় অন্ধ হয়ে পড়েছেন। তিরিশ বছর কাজ করার পরে বাবার চাকরি গেল। তখন আর কিছুই নাকি কাজ করতে পারতেন না। তারপর অন্য দু-একটা প্রেসেও বাবা কাজ করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সত্যিই বাবার তখন কাজ করবার কোনো ক্ষমতা ছিল না।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। বললাম, ঠিকমত কাজ কর।

তুমিই তো বড়—সমস্ত সংসার তো এখন তোমার উপর নির্ভরশীল। তোমাকে আমি ওভার-টাইম দেওয়ার চেষ্টা করব।

মণিমালা কৃতজ্ঞতার হাসি হাসল।

তারপর থেকে মণিমালাকে আমি বেশি করে ওভারটাইম দেওয়ার চেষ্টা করি। গড়ে মাসে প্রায় শ'দেড়েক টাকার মতন হতে লাগল ওর। এক বছর হলে কিছু মাইনে বাড়িয়ে দেওয়ার কথাও মনে মনে ভেবে রেখেছি। তারাপদবাবুকে ডেকে বলে দিয়েছি, কিছু কিছু মেক-আপের কাজ শেখান। কাজের মেয়ে। চট করে সব কাজ শিখে ফেলবে, দেখবেন।

তারাপদবাবুও আমার সঙ্গে একমত হয়েছেন। সুযোগ হলেই কিছু কিছু কঠিন জব কাজ মণিমালাকে দিয়ে করাতে শুরু করেছেন। এবং এই ছ'মাসে মণিমালা সবরকম কম্পোজের কাজই কিছু না কিছু শিখে ফেলেছে।

এই ছ'মাসে একদিনের জন্যেও কামাই করে নি মণিমালা। কিন্তু হঠাৎ একদিন সে এল না। প্রথমদিন আমি ভাবলাম, হয়তো কোনো কাজে আটকে গিয়েছে। কিন্তু পরপর দু'দিন। একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম। তারাপদবাবুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, মণিমালা আসছে না কেন?

ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে ওর বাবার অসুখের কথা বলছিল কয়েকদিন ধরে। বেড়ে গেল কিনা কে জানে?

বাবার অসুখ! কই, আমি কিছু জানি না তো?

আপনাকে বলবে-বলবে ভাবছিল। বোধহয় বলা হয়ে ওঠে নি।

আপনি ওর বাড়ি চেনেন?

হ্যাঁ, একদিন রাতে এগিয়ে দিতে গিয়েছিলাম।

আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে খবরটা নিয়ে যান তো!

আচ্ছা। তারাপদবাবু চলে গেলেন।

কি জানি মণিমালার জন্যে মনটা কেমন খারাপ লাগল। বারবার মনে হতে লাগল, বেচারা!

পরদিন। কাজে আসতে না আসতেই তারাপদবাবু অশুভ সংবাদটি দিলেন।

আমি কিছুটা চমকে উঠলাম, কি বললেন?

হ্যাঁ। শেষ যেদিন কাজ করে গেছে সেদিন রাতেই ওর বাবা হঠাৎ মারা গেছেন। ওরা নাকি ঠিক বুঝতে পারে নি। হার্টফেল বোধহয়। ডাক্তার ডেকেছিল। তার আগেই সব শেষ। ভীষণ খারাপ লাগল। দু'দিনেই মেয়েটার চেহারা একেবারে আর্ধেক হয়ে গেছে! তারাপদবাবু চুপ করলেন।

তা দু'দিনের মধ্যে কোনো খবর দেয় নি কেন? টাকাপয়সার দরকার হতে পারে। আমাকে জানানো উচিত ছিল। আমি খানিকটা রাগের সুরেই বললাম।

হ্যাঁ, তাই বলছিল। বলছিল, আমার খবর দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, একা মানুষ, পেরে উঠি নি। আপনি বাবুকে বলে দেবেন। আর বলেছে, যদি সম্ভব হয় কিছু টাকা দিলে ওর বড় উপকার হয়।

মেয়েটির উপর দিনে দিনে কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিল। ওর দুঃখে মনে মনে একটা ব্যথা অনুভব করছিলাম। ওর বিষণ্ণতার ছোঁয়া যেন কিছুটা আমারও মনে এসে লাগছিল।

সেদিনই সন্ধ্যায় তারাপদবাবুকে নিয়ে মণিমালার বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। আমাকে দেখে কেমন যেন চমকে উঠল মণিমালা। ওর বাড়ি যাব বোধহয় একদম ভাবতে পারে নি। তাড়াতাড়ি একটা ছেঁড়া মাদুর এনে বাইরে পেতে দিল। আমি লক্ষ্য করলাম, ওর

সুন্দর দুটি চোখ দু'দিনেই কেমন বিশ্রী কালো হয়ে উঠেছে। চোখের কোণে গভীর বিষণ্ণতা। একটা কান্না ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে, একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়।

মানিকতলার পুরনো বস্তি। শহর কলকাতার আদি রূপ। টালিঢাকা একটা ছোট্ট ঘরে মণিমালাদের আস্তানা। তার মধ্যে এতদিন ধরে চারটে মানুষ কিভাবে মাথা গুঁজে বাঁচছিল ভাবলে অবাক হতে হয়।

একেই শোকার্ত আবহাওয়া, তার উপর দমবন্ধ গুমোট পরিবেশ। আমি কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠছিলাম। তাছাড়া মণিমালার করুণ চোখের দৃষ্টি আমাকে বেদনার্ত করে তুলছিল। মণিমালার হাতে একশ' টাকার দু'টো নোট গুঁজে দিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম। আসবার সময় বলে এলাম—যদি আরও দরকার হয়, লোক পাঠিও। সংকোচ কর না।

কেমন যেন অসহায় দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকাল মণিমালা।

মণিমালা আর লোক পাঠায়নি। কয়েকদিন পরে নিজেই কাজে যোগ দিয়েছে। লক্ষ্য করলাম ঠোঁটের কোণের সেই স্বাভাবিক হাসি কয়েকদিনের মধ্যে কোথায় যেন উড়ে গেছে। আমার খুব খারাপ লাগত। আমি ডেকে কোনো কথা জিগ্যেস করি নি। আমি জানতাম দুঃখের দিনে মানুষকে মুখে সান্ত্বনা দেওয়া নিতান্তই মামুলী ব্যাপার।

শোক মানুষকে বেশি দিন বেঁধে রাখতে পারে না। মণিমালাকেও পারে নি। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে সে। চোখ-মুখের বিষণ্ণতা ঝেড়ে ফেলে আবার আগের মতো সহজ হয়ে উঠেছে মণিমালা। কথা বলার সময় ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি আবার সবসময় ফুটে ওঠে। সুন্দর চোখ দু'টি আবার যেন ক্রমশ সহজ হয়ে উঠছে।

একদিন মণিমালাকে ডেকে বললাম, তোমার কোনো দরকার হলে আমাকে বলো, এখন একেবারে একা পড়ে গিয়েছ।

ঠোঁটের কোণে সেইরকম হাসি ফুটিয়ে মণিমালা বলল, অসুবিধা হচ্ছে না। আমার সেই মামাতো ভাই, যে আমাকে কাজ শিখিয়েছিল, সে আমাদের বাড়িতে এসে আছে। অসুবিধে হলে আপনাকে নিশ্চয় বলব। আপনি যা করেছেন তা আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম, যাক্, তোমাকে আর কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে না। যা বললাম তাই মনে রেখ।

ছোট্ট 'আচ্ছা' বলে মণিমালা বেরিয়ে গেল।

এরপর বোধহয় আরো একবছর কেটে গেছে। মণিমালার মাইনে আরও দশ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছি। বাবার মৃত্যুর জন্যে যা অগ্রিম দিয়েছিলাম, তা মাসে মাসে মণিমালা শোধ করে দিয়েছে।

আমিও মনে মনে তৃপ্তি বোধ করেছি, যাক্ একটি মেয়ের জীবনে আমি কিছুটা সাহায্য করতে পেরেছি।

তারপর সেদিনকার কথা।

মণিমালা আমার সামনে লাল কালিতে ছাপা হলুদ রঙের একটা চিঠি এগিয়ে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

চিঠিটা পড়ে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। কোনো কথা বলতে পারলাম না। চোখ মেলে শুধু ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ওর মুখের রং কেমন অস্বাভাবিকভাবে পাল্টে গেছে। তুলি দিয়ে কে যেন এক পোছ ঝকঝকে আলো ওর মুখে মাখিয়ে দিয়েছে। চোখের নিচে একটা স্বপ্ন যেন নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে হাতের আঙুলে শাড়ির আঁচল জড়াচ্ছিল মণিমালা।

আমাদের দু'জনের মাঝে একটা নিস্তব্ধতা যেন দেওয়ালের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

নিস্তব্ধতার দেওয়াল ভেঙে আমিই প্রথম কথা বললাম, ব্যাপার কি? একেবারে সারপ্রাইজ দিচ্ছ। ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি নি।

মণিমালা কোনো কথা বলল না। এমনকি মাটি থেকে চোখ পর্যন্ত তুলল না।

আমি ঠাট্টা করে বললাম, নিজেই ঠিক করলে নাকি?

মণিমালা তবুও কোনো সাড়া দিল না। ওর সহজ ভাবটা যেন কেটে গেছে। ছোট্ট রোগা শরীরটা নিমেষের মধ্যে গুটিয়ে যেন আরও ছোট্ট হয়ে গেল।

তারপর একটু চুপ করে থেকে মণিমালা বলল, যাবেন কিন্তু!

আমি প্রায় লাফিয়ে উঠলাম, নিশ্চয়। তোমার বিয়েতে যাব না, এ কখনো হতে পারে!

মণিমালা আর দাঁড়াতে পারল না। বেরিয়ে গেল।

মণিমালার বিয়েতে আমি কিন্তু যেতে পারি নি। কথা দিয়েছিলাম কিন্তু কথা রাখতে পারি নি। একটা বিশেষ জরুরী কাজে হঠাৎ আমাকে বাইরে চলে যেতে হয়েছিল। তারপদবাবুর হাত দিয়ে শুধু একটা উপহার পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

মণিমালা এরপর আমাকে অভিযোগ করেছে। এবং সেই অভিযোগ খণ্ডন করতে একদিন আমি মণিমালার বাড়ি গিয়েছি।

সত্যি বলতে কি সেদিনও আমাকে অবাক করে দিয়েছে মণিমালা। একতলার ছোট্ট একখানা ঘর। কিন্তু কি সুন্দরভাবে সাজানো! শিয়ালদা থেকে অল্প দামে টেবিল, চেয়ার, খাট, আলমারি কিনে সুন্দর করে ঘর সাজিয়েছে মণিমালা। দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর ছবি টাঙিয়েছে। অল্প সামর্থ্যেই সুন্দরভাবে সংসার সাজাতে জানে মণিমালা।

ওর স্বামীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। সুন্দর ছেলে। সেও কম্পোজিটর। আগের প্রেসে একসঙ্গে কাজ করত।

সেদিন মণিমালার সাজানো সুন্দর সংসার থেকে বেরিয়ে এসে আমার বারবার মনে হচ্ছিল, জীবন কত সুন্দর কত মধুর!

মণিমালা যেন সেই সুন্দর আর মধুর জীবনের প্রতীক।

ইরাবতী

ইরাবতী প্রজাপতি ধরতে ভালোবাসত।

আমাদের বাড়ির সামনে ছিল সুন্দর ফুলের বাগান। বাবার নিজের হাতে গড়া। লাল, গোলাপী, শাদা, কত রকমের গোলাপ যে ফুটত বাগানে। বাবা নিজের হাতে বাগানের যত্ন করতেন। কারো ঢোকার অধিকার ছিল না বাগানে। আমারা ভুল করেও কোনোদিন একটা গোলাপ তুলেছি বলে মনে পড়ে না।

কিন্তু আশ্চর্য! ইরাবতীর ক্ষেত্রে বাবা তাঁর নিজের হাতে গড়া নিয়ম লঙ্ঘন করতেন। যখন-তখন খুশিমত ইরাবতী বাবার শখের বাগানে ঢুকত, ফুলের বুকে লেগে থাকা রঙ-বেরঙের প্রজাপতি ধরত আর বাবার চোখাচোখি হলেই একতাড়া শাদা গোলাপের মতো দাঁত বের করে খিল খিল করে হেসে উঠত। বাবা প্রায়ই তার রেশমের মতো নরম চুলের মাঝে হাত বুলিয়ে তাকে কোলের কাছে টেনে নিতেন। আমি দূর থেকে লক্ষ্য করতাম, রামধনুর মতো বিচিত্র রঙে রঙীন প্রজাপতিকে বাবার চোখের সামনে যেন মেলে ধরছে ইরাবতী, আর বাবা শিশুর মতো চোখে সেই রঙের মাঝে তাকিয়ে আছেন। মনে-মনে ইরাবতীর প্রতি ঈর্ষা বোধ করতাম। মনে হতো বাবার সবটুকু আদর সে যেন একাই কুড়িয়ে নিচ্ছে।

আমাদের ঠিক পাশের বাড়িতেই ইরাবতীরা থাকত। ইরাবতীর বাবা ছিলেন সার্কেল অফিসার। প্রায়ই বাইরে-বাইরে ঘুরতেন। ছোট্ট সংসার। মা, বাবা, ইরাবতী আর ছোট্ট এক ভাই।

ইরাবতীর তখন আর কত বয়স হবে! বড়জোর বছর দশেক। আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। আমি সেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি। কলকাতার কলেজে পড়বার তোড়জোড় চলছে। অফুরন্ত অবসর। ফুটবল খেলে আর মাছ ধরে সময় কাটাই।

একদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে না হতেই আকাশ জুড়ে কালো মেঘ ঘনিয়ে এল। কেন জানি না মেঘে-ঢাকা আকাশ দেখতে আমার ভীষণ ভালো লাগত। বাইরের বারান্দায় বসে চুপচাপ আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় শুনতে পেলাম কে যেন সুন্দর মিষ্টি গলায় গান ধরেছে। গানের সুরের মাঝে আমি ক্রমশ যেন ডুবে যেতে লাগলাম। সেই গান আমার মনটাকে সহসা কেমন যেন উদাসীন করে দিতে লাগল।

আমি একবারও ভাববার অবসর পেলাম না এমন মিষ্টি গলা কার হতে পারে। আমার মনে হল কে যেন অত্যন্ত গোপনে হাওয়ায়-হাওয়ায় সুরগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। ক্রমশ সে-সুর আমার মাঝে, আমার সমস্ত সত্তার গভীরে ডুবে যাচ্ছে।

তারপর সেদিন আমি প্রথম চোখ খুলে আলো দেখার মতো বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলাম যখন দেখলাম হাওয়ায় সুর ছড়িয়ে-ছড়িয়ে ইরাবতী তন্ময়ভাবে আমাদের ফুলের বাগানের দিকে এগিয়ে আসছে। ইরাবতীর মাঝে সেই কিশোর বয়সে এক নতুন সত্য যেন আবিষ্কার করেছিলাম। দশ বছরের মেয়েটি সেদিন আমার মনের কোণে এক নতুন বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছিল।

তারপর আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। বারান্দা ছেড়ে আমি ঘরের মাঝে আশ্রয় নিলাম। আর জানালার শিক গলিয়ে লক্ষ্য করলাম বৃষ্টিভেজা শরীরে নেচে-নেচে অজস্র প্রজাপতি ধরল

ইরাবতী। বৃষ্টিভেজা ইরাবতীর দিকে তাকিয়ে সেদিন আমার মনে হয়েছিল প্রজাপতির চেয়ে আরো অনেক বেশি রঙীন যেন ইরাবতী। তার সমস্ত শরীরে যেন অজস্র রঙের ছটা। সেদিন, সেই মুহূর্তে, আমি একবারের জন্যেও ইরাবতীর প্রতি কোনোরকম ঈর্ষা বোধ করি নি।

পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। মফস্বল শহরের জীবন ছেড়ে মহানগরী কলকাতার জীবনে এসে আশ্রয় নিয়েছি। তারপর ধীরে ধীরে কলকাতার চলমান জীবনের ছন্দের সঙ্গে একাত্মভাবে মিশে গিয়েছি। মন থেকে আস্তে আস্তে মুছে গিয়েছে সেই সুন্দর ফুলের বাগান, রঙ-বেরঙের প্রজাপতি আর শিশিরভেজা সকালের মতো সেই ছোট্ট মেয়ে ইরাবতী।

মাঝে-মধ্যে ছুটিছাটায় দু-একবার বাড়ি গিয়েছি। মাঝে-মধ্যে ইরাবতীকে দেখেছিও। নেচে-নেচে তখনও সে প্রজাপতি ধরে। তবে, তার সুমিষ্ট কণ্ঠের সুর ছড়ানো সেই গান আর কোনোদিন শুনেছি বলে মনে পড়ে না। স্মৃতি থেকে ধীরে ধীরে ইরাবতীর সেদিনের সেই সুরের রেশ কখন ঝরে পড়েছে খেয়াল করি নি।

কলেজ-জীবনও ক্রমশ শেষ হয়ে গিয়েছে। নিজের অজান্তেই অনেকটা সময় যেন আমার কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছে। কর্মজীবনে ঢুকবার আগে কয়েকদিনের জন্যে বাড়ি এসেছি। বাঙলাদেশের বাইরে চাকরি পেয়েছি। বাবা চিঠি লিখেছিলেন, প্রবাসে যাওয়ার আগে কয়েকদিন যেন তাঁর কাছে কাটিয়ে যাই। ছেলেবেলা থেকেই মাকে হারিয়েছি। বাবার মাঝেই মাতৃস্নেহের রূপটি চিরকাল খুঁজে পেয়েছি। বাবা যেন মা-বাবার যৌথ স্নেহের প্রতীক।

রাত্রে বাবার পাশে খেতে বসেছি। হঠাৎ কথায়-কথায় বাবা জানালেন, ইরাবতীর বাবা যতীনবাবু বদলী হয়ে যাচ্ছেন। ইরাবতীকে

নিজের মেয়ের চেয়েও বোধহয় বেশি স্নেহ করতেন বাবা। সংবাদটি দেওয়ার সময় বাবার চোখের কোণে কিরকম যেন একটা ব্যথার সন্ধান পেলাম আমি।

আমি মুখ না তুলেই জিগ্যেস করলাম, কবে যাচ্ছেন?

দু-এক দিনের মধ্যেই। বাবা জবাব দিলেন।

ইরার পড়ার কি হবে? আমি হঠাৎ প্রশ্ন করলাম।

বাবা কি বুঝলেন কে জানে! একটু হাসলেন। বাঙলাদেশে কি স্কুল একটা? ওখানেই পড়বে।

আমি চুপ করে থাকলাম। আর কোনো প্রসঙ্গ তুললাম না। বাবাও আর কথা বললেন না। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লেন।

পরের দিন সকালবেলা। বাবার ফুলের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আরও অনেক ফুলের গাছ লাগিয়েছেন বাবা। বাবার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গী এই বাগান ক্রমশ যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে, কৈশোর ছেড়ে যৌবনের পথে পা দিয়েছে। যে-কোনো মানুষকে অন্তত মুহূর্তের জন্যে আশ্রয় দিতে পারে এই বাগান। বিষণ্ণতার মাঝে ঠিক এক ঝলক হাসির মতো।

এইসব কথা ভাবছি আর বাবার নিঃসঙ্গ জীবনের জন্যে মনে মনে দুঃখবোধ করছি। কেন জানি না মাকে জ্ঞান হয়ে আমি না দেখলেও সেদিন, সেই মুহূর্তে, বারবার মায়ের কথাই আমার মনে হতে লাগল।

আর তখনই আমি লক্ষ্য করলাম একঝাঁক প্রজাপতি নিমেষের মধ্যে আমার চোখের সামনে এসে তাদের রঙের পাখা মেলে ধরল। প্রজাপতির রঙের দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ল ইরাবতীর কথা। চিৎকার করে ইরাবতীকে ডাকতে ইচ্ছে করল। কিন্তু কেন জানি

না আমি ডাকতে পারলাম না। আমার গলা দিয়ে কোনো স্বর বের হল না। সত্যিই এই কয়েক বছরে আমি অনেকটা পাল্টে গিয়েছি!

একটু বেলা হলে বাবা ইরাবতীকে ডাকলেন। আর ইরাবতীকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আমার চোখ এড়িয়ে ইরাবতী কখন যে বড় হয়ে উঠেছে আমি খেয়ালই করতে পারি নি। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। রেশমের মতো চুলে খোঁপা বেঁধেছে। আর খোঁপায় গুঁজেছে আমাদেরই বাগানের একটি লালগোলাপ। প্রজাপতির সমস্ত রঙ ইরাবতীর চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ কেমন যেন সলজ্জ হয়ে উঠেছে ইরাবতী।

তারপর মনে আছে আমাদের শহর ছেড়ে যাওয়ার আগে দু' দিনের সবটুকু সময় বোধহয় আমাদের বাড়িতেই কাটিয়েছিল ইরাবতী। বাবার স্নেহের কথা ওর মা-বাবা জানতেন। তাই একবারের জন্যেও ডাকেন নি তাকে। আর বাবার স্নেহের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে আমি যে গোপনে মনের পটে ওর সুন্দর মুখের ছবি এঁকে নিয়েছিলাম, সে-সংবাদ ওর বাড়ির লোক রাখেন নি, রাখবার কথা ভাবতেও পারেন নি।

আমার চোখের সামনে সেদিনও ইরাবতী প্রজাপতি ধরেছিল। আর শাদা গোলাপের মতো দাঁত বের করে হাসতে-হাসতে হাওয়ায় আবার প্রজাপতি উড়িয়ে দিয়েছিল। বাড়ির ছাদে বসে সেদিন ইরাবতী আমাকে অনেক গান শুনিয়েছিল। গান গাওয়ার সময় আমি দুই চোখ মেলে ওর আশ্চর্য কোমল সৌন্দর্য অনুভব করবার চেষ্টা করেছিলাম। ইরাবতীর কাছাকাছি বসে সেদিন যেন আমি ইরাবতীর অস্তিত্বের সাড়া অনুভব করেছিলাম। গোলাপের গন্ধের চেয়েও তার ডাক বুঝি আরো বেশি মুগ্ধকর। প্রথম যৌবনে দাঁড়িয়ে সেদিন মনে হয়েছিল, দিনগুলো যদি নিজের ইচ্ছেমত এমনভাবেই ধরে রাখা যেত!

তারপর ইরাবতীরা চলে গিয়েছে। আমিও প্রবাসে কর্মজীবনে মিশে গিয়েছি। ধীরে ধীরে মনের পটে আঁকা ইরাবতীর মুখখানা কোথায় হারিয়ে গেছে। প্রথম যৌবনের স্মৃতিটুকুও আস্তে আস্তে মুছে ফেলেছি। মাঝে মাঝে বাবার চিঠিতে ইরাবতীদের খবর পাই। বুঝি, বাবার সঙ্গে এখনও চিঠিপত্রের যোগাযোগ আছে। তারপর বাবা মারা গেলেন। ইরাবতীর শেষ রেশটুকুও আমার কাছ থেকে চিরকালের জন্যে মুছে গেল। কোনো অবসর মুহূর্তেও ইরাবতীর মুখ আর ভেসে ওঠে না। সময় এমনিভাবেই বোধহয় সমস্ত স্মৃতিকে মুছে দেয়।

পদমর্যাদায় তখন আমি এক স্বতন্ত্র মানুষ। অন্য সত্তার অধিকারী। অন্য পরিবেশে, অন্য জীবনে অতীতের আলো-ঝলমল দিনগুলোকে হারিয়ে ফেলেছি। ভুলেই গিয়েছি প্রজাপতির রঙ আর বাবার শখের ফুলের বাগান।

তারপর নতুন চাকরি নিয়ে কলকাতার বাইরে এক বড় শহরে চলে এসেছি। সংসার পেতেছি। জীবনের নতুন এক অধ্যায় শুরু করেছি। আমি আমার আগের আমিকে আস্তে আস্তে ভুলতে বসেছি।

কলেজ-জীবনের শহরবাসের সঙ্গে সঙ্গে এ শহরবাসের যেন অনেক পার্থক্য। শহরের কোলাহলে ক্রমশ যেন আমি ক্লান্ত হয়ে উঠতে লাগলাম। তাই, সময় পেলেই বেরিয়ে যাই, মাঠে ঘুরি, নদীর ধারে বেড়াই, শহরতলির রাস্তা ধরে একা-একা হেঁটে চলি। আর মাঝে মাঝে একা-একা বিনা কারণে স্টেশনে আসি। শহরের কোলাহল মারাত্মক মনে হলেও কেন জানি না উচ্চকিত গতিময় রেল-স্টেশন আমার খুব ভালো লাগে। স্টেশন আমাকে কেমন যেন আকর্ষণ করে। স্টেশনে দাঁড়িয়ে আমি যেন চলমান জীবনের স্বাদ অনুভব করি।

রবিবারের বিকেল। সেদিনও স্টেশনের নেশা আমাকে হঠাৎ যেন পেয়ে বসল। চলতে চলতে তাই স্টেশনে এসে দাঁড়ালাম। গতিময়

ছন্দের আকর্ষণ আমার সমস্ত রক্তকে চঞ্চল করে তুলেছিল। আর স্টেশনে এসে দাঁড়াতেই আমার কানে ভেসে উঠল মাইকের ঘোষণা :

এক নম্বর লোক্যাল, সাতটা দশ মিনিটে চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে। অমুকপুর, তমুকনগর থামবে না! আপনারা ভালো করে শুনুন। এক নম্বর লোক্যাল, এক নম্বর লোক্যাল···স্টেশনের জেগে ওঠা কোলাহলের মাঝে সুমিষ্ট কণ্ঠের ঘোষণাকে মনে হচ্ছিল কেমন যেন আচমকা, বন্ধ জানালা গলিয়ে ঠিকরে-আসা আলোর মতো। ইঞ্জিনের শব্দ, একসঙ্গে লক্ষ মানুষের নিঃশ্বাসের মতো।

প্রৌঢ় দুই ভদ্রলোক আমার পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে ইংরেজীতে মন্তব্য করলেন। ভাষার তর্জমা করলে এইরকম দাঁড়ায়– শুনে নাও, শুনে নাও কেষ্ট। আহা, এমনি মিষ্টি কথা। পরান একেবারে জল করে দেচ্ছে রে! বলতে বলতে এক ভদ্রলোক সঙ্গীটিকে ঠ্যালা মারলেন। কেষ্ট শুধু একটু মৃদু হাসলেন। অন্য কোনো মন্তব্য করলেন না।

মাইকে তখনও থেকে থেকে ঘোষণা ভেসে আসছে : শুনুন, শুনুন আপনারা, এক নম্বর লোক্যাল······। প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঠিকই বলেছেন, সত্যিই মেয়েটির কণ্ঠস্বর ভারি মিষ্টি, বাচনভঙ্গি সত্যিই সুন্দর। প্রতিটি কথাকে যেন মেপে মেপে যাচাই করে বলা হচ্ছে।

মনে হল ঘুরে ঘুরে স্টেশনের বিচিত্র মানুষের বিচিত্র গতিময়তা লক্ষ্য করা যাক। কতবার তো স্টেশনে এসেছি, কতবার ফিরে গিয়েছি। কিন্তু গতিময়তার মধ্যে যে একটা সরল জীবন্ত ছবি লুকিয়ে আছে, তা লক্ষ্য করি নি কোনোদিন। এই নতুন সত্য আবিষ্কারের আনন্দ সত্যিই আমার খুব ভালো লাগছিল। মনে হচ্ছিল, আরও আরও অনেকক্ষণ স্টেশনে থেকে যাই, মানুষের জীবনের মাঝেও যে-জীবন, তাকে খোলা চোখে প্রাণভরে দেখে যাই। মনে হচ্ছিল ট্রেন আরও খানিকটা লেট করুক। আরও কিছুক্ষণ আমি এই ছন্দময়

জীবনের মাঝে ডুবে থাকি। ডুবুরির মতো আমি মুক্তোর সন্ধান করি।

আর এমনি মুক্তোর সন্ধান করতে করতে সেদিন আকস্মিকভাবে আমার ইরাবতীর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। আমি ঠিক চিনতে পারি নি। চেনা সম্ভবও নয়। প্রজাপতির সেই রঙ ঝরে কেমন একটা বিষণ্ণতার রঙ লেগে আছে চোখের কোণে। ছলছলে সেই দৃষ্টি কেমন যেন ফ্যাকাশে, ফাঁকা-ফাঁকা।

আমি পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। ইরাবতীই আমাকে ডাকল, সতুদা না?

আমি বোবা চোখে তাকিয়ে আছি দেখে তার শাদা গোলাপের মতো দাঁতে হাসি ঝরিয়ে বলল, চিনতে পারছ না? বাব্বা! এত পরিবর্তন! আমি ইরা।

এমন এক-একটা মুহূর্ত আসে যখন নিজের নির্বুদ্ধিতার লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করে, আমারও তাই হয়েছিল। ইরাবতীকে আমি চিনতে পারি নি, এ-কথা ভেবেই আমি যেন লজ্জায় গুটিয়ে গিয়েছিলাম।

তারপর স্টেশনে চায়ের দোকানে বসে অনেকক্ষণ কাটিয়েছিলাম ইরাবতীর সঙ্গে। মুছে যাওয়া দিনগুলোর স্মৃতি ধীরে ধীরে মনের মাঝে ভেসে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল, ফ্রক পরা সেই ছোট্ট মেয়েটি বৃষ্টিতে শরীর ভিজিয়ে আমার চোখের সামনে যেন রঙ-বেরঙের প্রজাপতি ধরছে। কান খাড়া করলেই হাওয়ায় ভেসে আসা সেই মিষ্টি গানের সুর যেন এখনও শোনা যায়। সেই দিনগুলোর সঙ্গে আজকের দিনের কত তফাৎ। সময় আমাদের কোথায় নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছে। জীবনে কোনোদিন কি ভাবতে পেরেছি এমন বিষণ্ণতার মূর্তি ধরে আমার চোখের সামনে ইরাবতী এসে দাঁড়াবে।

অমার মনের ভাব বোধহয় ইরাবতী লক্ষ্য করেছিল। তাই জিগ্যেস করল, কি ভাবছ?

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম, কই, কিছু নয় তো !

ইরাবতী একটু ম্লানভাবে হাসল। আমার মতো সেও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। আমি তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম। ইরাবতীর কথা জানার জন্যে আমার মন ক্রমশ ব্যগ্র হয়ে উঠছিল। জিগ্যেস করলাম, কোথায় থাক ?

শহরতলীতে।

স্বামী ভদ্রলোক কি করেন ?

মার্চেণ্ট অফিসের কেরানী।

ছেলে-মেয়ে ?

তিনটি।

তুমি চাকরি করলে ছেলে-মেয়ের অসুবিধা হয় না ?

হয়।

তবে কর কেন ?

দরকার, বলে সেই ছেলেবেলার মতো খিলখিল করে হেসে উঠল ইরাবতী। বাব্বা ! তুমি যে একেবারে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে জেরা শুরু করেছ !

কেন জানি না, আমি ইরাবতীর সঙ্গে হাসিতে যোগ দিতে পারলাম না। আমার মনে হতে লাগল তার সেই প্রাণখোলা হাসির মধ্যে দিয়ে ইরাবতী আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে, এসব কথা জানবার তোমার কোনো অধিকার নেই।

ইরাবতীকে বিদায় দিয়ে সেদিন বাড়ি ফিরে এলাম। আসার আগে জেনে এলাম, যার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের ঘোষণা, অনেকের মনকেই একটু আগে উৎকর্ণ করে তুলেছিল, সে কণ্ঠস্বর আর কারোর নয়, স্বয়ং ইরাবতীর।

কিসের টানে কেন জানি, পরের রবিবারের বিকালেও আমি স্টেশনে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম। জীবনের গতিময়তার ছন্দ অনুভব করবার আকর্ষণ সেদিন আমার ছিল না। আমি সোজা স্টেশন

মাস্টারের ঘরে গিয়ে ইরাবতীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। স্টেশন মাস্টার ভদ্রলোক উঠে ছোট্ট জানালার কপাট খুলে পাশের ঘরের সঙ্গে কি যেন কথা বললেন, আর তারপর আমাকে সোজা নিয়ে ইরাবতীর কাছে পৌঁছে দিলেন।

ইরাবতী আমাকে দেখে একটুও অবাক হল না। এই মুহূর্তে আমার উপস্থিতি তার কাছে একান্তভাবেই যেন স্বাভাবিক ছিল। আমাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, বসো। কথা বলো না। আমি ঘোষণাটা করে নেই।

এয়ারকণ্ডিশনড্ ঘর। বাইরের কোলাহলের কোনো শব্দ ভেসে আসে না। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ নিজেই শোনা যায়।

ইরাবতীর সামনে টেবিল। টেবিলে ছোট্ট রেডিয়োর মতো একটা যন্ত্র। ওখানে সুইচ টিপে মুখ রেখে কথা বললেই বাইরের অজস্র অ্যামপ্লিফায়ারে সেই কথাগুলো ভেসে যায়। আমাকে বসিয়ে সুইচ টিপে কথা কেটে কেটে একটি ঘোষণা করল ইরাবতী। নির্দেশমতো আমি একটিও কথা বললাম না। বুঝলাম, বললেই তা বাইরের মাইকে ভেসে উঠবে। সুইচ বন্ধ করে আমার আরও কাছে চেয়ার টেনে নিল ইরাবতী, কি মনে করে?

এমনি, দেখতে, আমি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম। ইরাবতী একটু হাসল, আমার তাহলে ভাগ্য বলতে হবে। আমি কোনো জবাব দিতে পারলাম না। চুপ করে থাকলাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কেউ কোনো কথা বলছি না। নিস্তব্ধ থমথমে পরিবেশ। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে আমিই প্রথম কথা বললাম, তোমাদের চাকরিটা বেশ মজার তো?

হ্যাঁ, ঐটেই লাভ। কোনো ঝামেলা নেই। এক ঘরে নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করে যাই। তাছাড়া সহকর্মী নেই বলে আর কোনো ঝামেলাও নেই।

আমি হাসলাম, বেশ সপ্রতিভ আর অভিজ্ঞ দেখছি।

দায়ে পড়ে। ইরাবতীও হাসল।

কিভাবে চাকরিতে ঢুকলে এখানে?—আমি জিগ্যেস করলাম।

রেলওয়ে সার্ভিস কমিশন পরীক্ষা দিলাম। তারপর পাশ করে গেলাম। কত শর্ত! ইংরেজি, বাংলা, হিন্দী, তিন-তিনটে ভাষা জানতে হবে। ভেবেছিলাম হবে না। কিন্তু হয়ে গেল। তারপর মাইক দিয়ে বাচনভঙ্গির ট্রেনিং দেওয়া হল। এখন তো অভ্যাস হয়ে গেছে। কথাগুলো প্রায় মুখস্ত পাখির মতো আওড়ে যাই।

কিরকম মাইনে পাও তোমরা? ইরাবতীর আর্থিক সঙ্গতির কথা আমার জানতে ইচ্ছে করল।

মাইনে সামান্য। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের স্কেল। তবে আমাদের একটা এক্সট্রা অ্যালাউন্স আছে।

এ কাজ ভালো লাগে?

এমনিতে মন্দ লাগে না। তবে মাঝে মাঝে একটু একঘেঁয়ে তো লাগেই—সব কাজেই ক্লান্তি আছে, বলে ইরাবতী চুপ করল। তারপর কিছুক্ষণ পর ইরাবতী আবার কথা বলল, তুদিন ধরে আমার কথাই তো খালি জিগ্যেস করছ। তোমার কথা তো কিছু বললে না! কোথায় আছ, কেমন আছ, বৌদি কেমন হয়েছেন?

ভালো! আমি সব প্রশ্নের একটি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম।

আমার জবাব শুনে ইরাবতী থামল। বুঝল নিজের কথা আমি বেশি বলতে চাইছি না। ইরাবতীর চোখের দিকে তাকিয়ে সেভাব লক্ষ্য করে আমি বললাম, একদিন যাব তোমাদের ওখানে।

সে আমার সৌভাগ্য। কিছুটা ঠাট্টা করেই বোধহয় বলল ইরাবতী।

ইতিমধ্যে ফোন বেজে উঠল। ফোনে কথা বলে ইরাবতী চেয়ার টেনে সুইচ খুলে আবার ঘোষণা করতে লাগল। আর সেই মুহূর্তে বহুকাল আগে একদিন ছাদে বসে ইরাবতীর গান গাওয়ার দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

ঘোষণা শেষ হলে আমি উঠে পড়লাম। ইরাবতীও আমাকে আর বসার জন্যে অনুরোধ করল না।

বাইরে কোলাহল। ইঞ্জিনের একটানা হুশহাশ শব্দ। সহস্র মানুষের কণ্ঠস্বর। সবকিছুর মাঝে হারিয়ে যেতে যেতে আমি শুনতে পেলাম, মাইকে ঘোষণা হচ্ছে—তুনম্বর লোক্যাল, আটটা তিরিশ মিনিটে ছয় নম্বর প্লাটফরম্ থেকে ছাড়বে। তুনম্বর লোক্যাল।

মনে হল, একদিন যে প্রাণময়তায় ইরাবতী ফুলের বাগানে প্রজাপতি ধরেছে আর অবাধ আনন্দে গান গেয়ে উঠেছে, তার সেই শক্তির উৎস আজো শুকিয়ে যায় নি। জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজো সে তার পরিশ্রমের বিনিময়ে গড়ে তুলছে একটি গোটা পরিবারের সুখী ভবিষ্যৎ।

মধুমিতা

অসম্ভব ! না, এ আমি পারব না ।

মুখের উপর এ-রকম জবাব আমি দেব হয়ত সুকুমারদা আশা করেন নি । বোবা চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন । তারপর প্রচণ্ডভাবে ফেটে পড়ে বললেন, ঠিক আছে, জীবনে তোমার মুখ আমি আর দর্শন করতে চাই না । জেনেশুনে একটা অন্যায়কে তুমি প্রশ্রয় দিচ্ছ । বলে আমার দিকে আর একবার তাকালেন সুকুমারদা । তারপর নিঃশব্দে ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে-হেঁচড়ে যেন বাইরে নিয়ে গেলেন ।

আমি দুঃখবোধ করলাম । অন্তত সেই মুহূর্তে সুকুমারদার জন্যে আমার খুবই খারাপ লাগতে লাগল । কিন্তু আমি অপারগ । সুকুমার-দার অন্যায় অনুরোধ রক্ষা করা কিছুতেই আমার পক্ষে সম্ভব নয় । আমি জানি তাঁর মনের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে । আর সেই আগুনে সেঁকে সেঁকে তিনি আমার কাছে কথাগুলি বলছিলেন । মধুমিতার নাম তিনি সহ্য করতে পারেন না । মধুমিতার প্রতি যে-কোনো রকমের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে তাঁর মন সব সময়ই ব্যগ্র । আর তার ফলেই দিনে-দিনে বিচার-বুদ্ধি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন । কোনো এক হিংস্র চেতনা প্রতি মুহূর্তে তাঁকে যেন পরিচালিত করছে ।

কিন্তু এরকম মানসিক অবস্থা যে সুকুমারদার হবে আমি জীবনেও

কল্পনা করি নি। চোখ বুঁজলেই আমি এখনও সেই আলো ঝলমল দিনগুলোকে দেখতে পাই। হাসি আর আনন্দের ঢেউয়ে নেচে-নেচে দুটি জীবন যেন পরিপূর্ণ হতে চলেছে এ-কথাই তখন আমার মনে হতো। বিকেলের পড়ন্ত রোদ যখন মধুমিতার রেশমের মতো চুলের মাঝে খেলা করত, ভোরের শিউলি ফুলের মতো সতেজ দৃষ্টিতে সে যখন সুকুমারদার দিকে আড়চোখে তাকাত, আমি তখন কাছে বসে লক্ষ্য করেছি কেমন মুহূর্তের মধ্যে আনমনা হয়ে উঠতেন সুকুমারদা। একটা প্রচণ্ড রাশভারী লোক মুহূর্তের মধ্যে কিভাকে ছোট্ট শিশুর মতো সরল হয়ে উঠতে পারে তা লক্ষ্য করে মনে-মনে আমি আনন্দ পেতাম। ভাবতাম, কি সুন্দর!

সুকুমারদার বিয়েতে আমিই ছিলাম প্রধান সাক্ষী। সারা দিন কি দুঃসহ উত্তেজনার মধ্যে আমার কাটল। তখন পৃথিবীতে সুকুমারদাকেই বোধহয় আমি সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করি। তাঁর যে-কোনো কথাকেই আমার কাছে মনে হয় চরম সত্য। তার সামনে বা পিছে আরও যে অনেক কথা থাকতে পারে তা ভাববার মতো অবস্থা তখন ছিল না আমার।

আমি সুকুমারদার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। সব কথা আমার কাছে তাই তিনি খুলে বলতেন না। আমিও জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন অনুভব করি নি কোনোদিন। যদিও সুকুমারদার সঙ্গে আমার কোনো রক্তের সম্পর্ক ছিল না, বরং এমন একটা সম্পর্ক যাকে বড়জোর পাড়া-প্রতিবেশীর সম্পর্ক বলা চলে, তবুও সে সম্পর্কের গভীরতা আমাকে এতটা জড়িয়ে ফেলেছিল যে তা কেটে বেরিয়ে আসবার কোনো ক্ষমতা আমার সেদিন ছিল না। এমন একটা শ্রদ্ধার আসনে সুকুমারদাকে আমি বসিয়েছিলাম যেখানে জীবনে বোধহয় একজন লোকই বসতে পারে।

আগের দিন রাত্রে মধুমিতার কথা আমাকে বললেন সুকুমারদা:

মধুমিতার বাড়িতে আপত্তি আছে। কাল কোনো রকমে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবে মধুমিতা আর তারপর বিকেল পাঁচটায় তাদের জীবনের নতুন ইতিহাস রচিত হবে। আমাকে একটা জায়গার কথা বলে দিলেন সুকুমারদা। মধুমিতা সেখানে বেলা তিনটেয় অপেক্ষা করবে এবং একটা ট্যাক্সি করে মধুমিতাকে আমার নিয়ে আসতে হবে।

কিন্তু আমি চিনব কি করে? আমি তো কোনোদিন দেখি নি। আমি নতুন এক সমস্যা তুললাম।

কি যেন এক মুহূর্ত ভাবলেন সুকুমারদা। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, ঠিক আছে, তোর চেনার দরকার নেই। সেই তোকে চিনে নেবে।

কি করে? আমাকে তো কোনোদিন দেখে নি? আমি সমস্যা তুলতে চাইলাম।

দেখার দরকার নেই। সুকুমারদা গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন।

মানে?

মানে, কিছু নয়। গিয়ে ছাখ আগে!

সুকুমারদা ঠিকই বলেছিলেন। আমি বাস থেকে নামতেই একটি মেয়ে সোজা আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি সত্যিই একটু বিস্মিত হয়ে গেলাম। আগে কোনোদিন, কোনো সময়, কোনোভাবেই মেয়েটিকে দেখেছি বলে আমার মনে পড়ল না। তবু কেন জানি মনে হল, এ নিশ্চয় মধুমিতা। একেই সুকুমারদার কাছে পৌঁছে দেওয়ার পবিত্র কর্তব্য পালন করতে আমি এসেছি।

মেয়েটি আমার কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। কোনো কথা বলল না। মাঝে মাঝে আড়চোখে শুধু আমার দিকে তাকাতে থাকল। আর আমি লক্ষ্য করলাম সব সময় আলতো ধরনের কি রকম একটা হাসি মেয়েটির ঠোঁটের কোণায় লেগে রয়েছে।

মনে মনে বেশ গৌরব অনুভব করছিলাম আমি। সব সময় মনে হচ্ছিল দারুণ একটা অসাধ্যসাধন করতে চলেছি। আমার উপর দুটি জীবনের ভাগ্য নির্ভর করছে। কোনো রকম দ্বিধা, সংকোচ বা ভয় প্রকাশ করা আমার পক্ষে কোনো মতেই উচিত নয়। তাই সাহসে ভর করে আমি খুব নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নাম কি মধুমিতা ?

নিমেষের মধ্যে হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে মেয়েটি তাকাল আমার দিকে। এবং কোনো কথা না বলে শুধু মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

আমি বললাম, দাঁড়ান, ট্যাক্সি ডাকছি।

সেদিন যথার্থ বন্ধুত্বের দায়িত্বই আমি পালন করেছিলাম। মধুমিতাকে ঠিক ঠিক পৌঁছে দিয়েছিলাম সুকুমারদার কাছে আর তারপর তাদের জীবনের চুক্তিপত্রে প্রথম সাক্ষীর নামসই করেছিলাম আমি। আমাকেই প্রধান সাক্ষী রেখে তারা তাদের পরস্পরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিল। আমি সেদিন মনে মনে এই ভেবে আনন্দ পেয়েছিলাম যে, এদের দুজনের জীবন গড়ার পথে সামান্যতম ভূমিকাও আমি পালন করতে পেরেছি।

কিন্তু আজ ? আজ কি আমার সেকথা মনে হচ্ছে ? সেদিনকার সেই মানুষ দুটির সঙ্গে আজকের মানুষ দুটির কত তফাৎ ! এক পথ ধরে দুজনে যে এতদিন একসঙ্গে হেঁটেছে তা বোঝার কোনো রকম উপায় নেই। আর যে ভূমিকা পালনের গর্বে সেদিন আমি গর্বিত হয়েছিলাম, সে গর্ব আজ আমার মাটিতে নুইয়ে পড়েছে। সুকুমারদা আজ অন্য মানুষ। অন্যায়ভাবে আমাকে অনুরোধ করে গেলেন আমি যেন মধুমিতার সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক না রাখি। আশ্চর্য ! মানুষ কত সহজে কত আশ্চর্যভাবে পাল্টে যায় !

আমি জানি, মধুমিতা সম্পর্কে কোনো রকম কথা বলার অধিকার

আজ তাঁর নেই। সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য তিনিই মূলত দায়ী বলে আমার মনে হয়। মধুমিতাকে তো অনেক দিন ধরে আমি চোখের সামনে দেখেছি। তার দিক থেকে বিশেষ কোনো ত্রুটি ঘটেছে বলে আমার কোনোদিন মনে হয় নি। তবে, হ্যাঁ, সততা তার মধ্যে ছিল। সহজ কথাটা সে সহজভাবে বলত।

শেষের দিকে প্রায়ই আমাকে বলত মধুমিতা, আচ্ছা তুমিই বলো, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মূল সূত্রটা কোথায়? সামান্যতম বিশ্বাসে যদি ফাটল ধরে তাহলে কি কখনও বাস করা সম্ভব? তুমিই বলো দুজন দুজনকে অশ্রদ্ধা করবে, ঘৃণা করবে, এই অশ্রদ্ধা আর ঘৃণা নিয়ে কখনও কি দৈনন্দিন বাস করা সম্ভব? আর করবেই বা কেন? বিয়েটা কি জীবনের আনন্দ না বন্ধন? তুমি তো অনেক পড়াশুনো করেছ। বলো না, আমি ঠিক বলছি কি না!

আমি চুপ করে থাকতাম। সত্যিই বড় কঠিন প্রশ্ন। এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমি কেন, কম লোকের পক্ষেই সম্ভব। মধুমিতার কথার মাঝে যুক্তি আছে, বিচার আছে, মানবিক প্রশ্ন আছে, সবই ঠিক। তবু মেনে নিতে কেমন লাগে। হয়ত আমাদের মনের জড়তা, হয়ত দ্বিধা, সঙ্কোচ। সত্যকে সত্য জেনেও মেনে নিতে কেমন লাগে। তাই চুপ করে থাকা ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে না।

মধুমিতার সঙ্গে যেন আমার বেশ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সুকুমারদার সম্পর্ক ছাড়াও একটি স্বতন্ত্র সত্তায় আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে মধুমিতা। তার কাছে যেতে আমার ভালো লাগে, তার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে। কেমন যেন একটা যুক্তি আর সততা দিয়ে মোড়া একটি মেয়ে।

মধুমিতা আমার চেয়ে বয়সে ছোট। আমাকে দাদা বলে ডাকে। প্রথমে আমি বৌদি বলতাম। কিন্তু মধুমিতা আপত্তি করতে নাম ধরেই ডাকি। যখন-তখন তাদের বাড়ি যাওয়ার আমার অবাধ অধিকার, সুকুমারদা থাকুন বা না থাকুন।

কতদিন মধুমিতা আর আমি বসে কত রকমের গল্প করেছি। সুকুমারদা প্রায়ই ঠাট্টা করত, দুজনেই সমান। জীবনেও সাবালক হবে না। ছেলেমানুষের মতো গল্প, গল্প আর গল্প।

মধুমিতা জবাব দিত, তুমি বুড়োমানুষ সেজে মুখে মুখোশ পরে জ্ঞান দিয়ে বেড়াও, দরকার নেই আমাদের সাবালক হওয়ার। কি বলো? বলে আমাকে সাক্ষী মানত।

আমি 'হ্যাঁ' 'না' কোনো জবাব না দিয়ে কেবল হাসতাম।

এমনি ভাবেই দিনগুলো বেশ চলছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে আমি লক্ষ্য করলাম, আমার চোখের সামনেই আবহাওয়া কেমন গম্ভীর হয়ে উঠল, হাসি-ঝলমল বাড়িটায় কেমন একটা থমথমে ভাব সব সময় বিরাজ করতে লাগল। মধুমিতা যদিও আমাকে দেখে অনেকটা সহজ হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু সুকুমারদা তা পারেন না। বেশির ভাগ দিনই আমার সঙ্গে কথা বলেন না। মুখে বই গুঁজে চুপচাপ বসে থাকেন।

আমি বুঝলাম, এ বাড়িতে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আমি সরে দাঁড়ালাম। আসা বন্ধ করলাম।

তারপর একদিন আকস্মিকভাবে মধুমিতা আমার কাছে গিয়ে হাজির। ক'দিনেই চেহারার কত পরিবর্তন ঘটেছে। চোখের কোণে কালি। ফুলের মতো হাসি যেন চুপসে গেছে। রেশমের মতো চুল-গুলোয় অযত্নে জট ধরেছে। বিষাদ-সাগরে এইমাত্র যেন ডুব দিয়ে উঠে এসেছে মধুমিতা।

অবস্থার গুরুত্ব অনুভব করে নরম স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার? কি মনে করে?

কেন? তোমার কাছে আসতে নিষেধ করে দিয়েছে নাকি?

আমি বুঝেও না বোঝার ভাণ করলাম, কে?

ন্যাকা সেজ না। আমি সরল মানুষ। সরলভাবে কথা বলো।

আমি বুঝলাম, এ মধুমিতা অন্য মানুষ। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

আমি চুপ করে থাকলাম। আর কোনো কথা না বলাই শ্রেয় মনে হল।

তারপর মধুমিতা তার সেই কঠিন প্রশ্ন আমার সামনে তুলে ধরল। এবং তারপর থেকে বার বার সেই একই প্রশ্ন সে আমার সামনে তুলে ধরেছে। কিন্তু আমি কোনো জবাব দিতে পারি নি। কোনো দিনই নয়। সে প্রশ্নের আজ সমাধান হয়ে গিয়েছে। তবুও আজও আমি তার সঠিক জবাব দিতে পারি না।

সুকুমারদা-মধুমিতা তাদের জীবনের চুক্তিপত্র আজ ছিঁড়ে ফেলেছে। আর প্রথম দিনের মতো আজও আমি প্রধান সাক্ষীর মতো দূরে দাঁড়িয়ে সে ঘটনা দেখছি। সেদিনকার সঙ্গে যদিও এ ভূমিকার অনেক তফাৎ, তবুও এ ভূমিকাকে আমি অস্বীকার করতে পারি না। মধুমিতাকে মুখে যে জবাব আমি দিতে পারি নি, হয়ত এই নীরব সাক্ষীর ভূমিকায় হাজির থেকে তার কিছুটা জবাব আমি দিতে পেরেছি। আর তাতে আমি সান্ত্বনাও বোধ করেছি। তাই সুকুমারদার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটলেও মধুমিতার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ আমি করতে পারি নি। করতে পারি নি বললে ভুল বলা হবে। কারণ, অন্তত কিছুকাল ধরে কোনোরকম যোগাযোগ মধুমিতার সঙ্গে আমার ছিল না। মধুমিতাও রাখে নি। আমিও রাখি নি। প্রত্যেকেই যে যার পথে নিজস্ব স্বতন্ত্রতায় ছিটকে পড়েছিলাম। চুক্তিপত্র ছিঁড়বার পর সেই যে মধুমিতা ভিড়ের মাঝে মিলিয়ে গেল তারপর থেকে তাকে আর দেখিও নি।

তারপর হঠাৎ। হঠাৎই বলব। কারণ, এ-ভাবে আবার মধু-মিতার সঙ্গে দেখা হবে ভাবতেই পারি নি। ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। আমি একটা ভালো চাকরি পেয়েছি। উত্তর কলকাতা ছেড়ে আভিজাত্যের মুখোশ এঁটে দক্ষিণ কলকাতায় আস্তানা গেড়েছি। দু-ঘরের সুন্দর একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট। একা থাকি, খুবই মেজাজে। মাঝে মাঝে সুকুমারদা আসেন। গল্প করেন। দু-জনের কেউই

মধুমিতার প্রসঙ্গ তুলি না। মনে মনে দু-জনেই এরকমের একটা চুক্তি করে নিয়েছি। এই ক'মাসে সুকুমারদা আরও যেন অনেক বুড়ো হয়ে গেছেন। হাঁটবার সময় মেরুদণ্ড অহেতুক কেমন যেন বেঁকে যায়।

যে-আসনে সুকুমারদাকে আমি বসিয়েছিলাম আজ আর সেখানে বসাতে তাঁকে পারি না। সুকুমারদার প্রতি সে শ্রদ্ধা আজ আর নেই। আমার বার বার মনে হয় জীবনের যে-পরিণতির মুখোমুখি এসে তাঁরা দাঁড়ালেন, তার জন্যে মূলত সুকুমারদাই দায়ী। মধুমিতার মধ্যেও যে একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে একথা তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে চান নি। মধুমিতাকে তিনি 'শো-কেসে' সাজিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। খেয়ালখুশি মতো তিনি তাঁর সৌন্দর্যসুধাটুকু পান করবেন। এ এক অদ্ভুত ধরনের ভালোবাসা। এর সঙ্গে গভীর মনুষ্যত্বের কোনোরকম সম্পর্ক আছে বলে আমার মনে হয় নি। আমার সব সময় মনে হতো সুকুমারদার ভিতরে একটা জান্তব প্রকৃতি গোপনে লুকিয়ে আছে। সুযোগ পেলেই সে মাথা চাড়া দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়।

আমার সামনেই অনেকদিন মধুমিতা বলেছে, তুমি কেন বুঝতে চাও না, আমার ভয়ানক একা একা লাগে। কোনো কাজ না করে মানুষ কখনো বাঁচতে পারে? ঘরে বসে বসে দিন কাটাব তো আমি লেখাপড়া শিখেছি কেন?

সুকুমারদা চুপ করে থাকতেন।

মাঝে মাঝে আমিও প্রতিবাদ করতাম, সত্যি, এ আপনার ভারি অন্যায় সুকুমারদা।

তারপর যেদিন সুকুমারদা ফস করে আমাকে বল বসলেন, এ ব্যাপারে তুমি কোনো কথা না বললেই আমি খুশি হব। সেদিন থেকে আমি চুপ করে গেলাম। বুঝলাম সুকুমারদার ভিতরে একরোখা একটা জেদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

তারপর ওদের দাম্পত্যজীবনের মাঝে আর আমি কোনোদিন

প্রবেশ করি নি। মধুমিতার প্রশ্নেরও কোনো জবাব আমি দিই নি। শুধু বিচ্ছেদের মুহূর্তে সাক্ষীর ভূমিকাটুকু পালন করেছি। আর দিনে দিনে স্কুমারদাকে ঘৃণা না করলেও অশ্রদ্ধা করতে শিখেছি। এবং তারপর থেকে আমার শেষ ভূমিকাটুকু পালন করা হয়ে গিয়েছে মনে করে ঐ প্রসঙ্গ আর কোনোদিন উত্থাপন করি নি। স্কুমারদাও করেন নি।

তবে মধুমিতা করেছিল। মধুমিতা করেছিল সেই প্রথম দিনই যেদিন আমি তাকে দেখে চমকে উঠেছিলাম।

সেদিন আমি অফিস যাই নি। শরীরটা খারাপ। দুপুরে একটা ডিটেকটিভ বইয়ে মুখ গুঁজে নায়কের বিস্ময়কর কীর্তিকলাপের জগতে হাবুডুবু খাচ্ছি এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল।

অত্যন্ত বিরক্তি নিয়ে দরজা খুলেই চমকে উঠলাম। আমার সামনে দাঁড়িয়ে মধুমিতা। অতি আধুনিকার পোশাকে সজ্জিতা।

মধুমিতাও আমাকে দেখে বোধহয় একটু চমকে উঠল। এক মুহূর্ত। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, ভিতরে আসতে পারি?

নিশ্চয়! বলে আমি পথ ছেড়ে দাঁড়ালাম।

সোজা আমার ঘরে গিয়ে সোফায় শরীর এলিয়ে দিল মধুমিতা। তারপর সহজভাবে বলল, ফ্যানটা ছেড়ে দাও। ঘেমে একেবারে ভূত হয়ে গেছি।

এমনভাবে কথাকটি বলল, যেন এ-বাড়িতে সে আদৌ নতুন নয়। নিত্যই তার আনাগোনা।

আমি অবাক চোখে মধুমিতাকে দেখছিলাম। এই এক বছরে অনেক বেশি সপ্রতিভ হয়ে উঠেছে। কথায়-বার্তায়, পোশাকে-আশাকে সর্বত্র আধুনিকতার ছাপ। রেশমের মতো চুলগুলোকে অদ্ভুতভাবে ছবির মতো প্যাকিয়ে-প্যাকিয়ে বেঁধেছে মধুমিতা। উজ্জ্বল রূপের মাঝে যেন কিঞ্চিৎ উগ্রতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে পোশাক পরার মাঝেও কোথাও যেন সেই উগ্রতা লুকিয়ে আছে।

আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মধুমিতার নতুন রূপ অনুভব করবার চেষ্টা করছিলাম।

মধুমিতা বোধহয় বুঝল। বললে, অবাক হচ্ছ ?

কিছুটা। আমি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম।

মধুমিতা হাসল। তবে আগের সেই হাসির সঙ্গে এ হাসির অনেক বেশি তফাৎ।

শরীরটাকে সোফার মাঝে এলিয়ে দিয়েই মধুমিতা জিজ্ঞেস করল, এখানে কতদিন এসেছ ?

মাস ছয়েক। তা তুমি জানলে কি করে ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

জানি না।

তবে এলে কি করে ?

ধরো আকস্মিকভাবে।

মানে ?

মানে আবার কি ? হঠাৎ চলে এলাম। বলতে বলতে এলানো শরীরটাকে তুলে সোজা হয়ে বসল মধুমিতা।

একথার অর্থ কিছুই না বুঝে আমি তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম।

মধুমিতা আবার হাসল। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, যাকগে। বেশ ভালোই আছি জান। বাব্বা ! একটা অসহ্য জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেকে একটু চিনতে পেরেছি। একাকীত্ব আমাকে আর 'বোর' করে না।

আমি বাধা দিলাম, ও-সব কথা থাক, মধুমিতা। যা চুকে গেছে, তাকে আর না তোলাই ভালো।

সেকথা তো আমি তুলছি না। আমি শুধু আমার কথা বলছি। মধুমিতা সহজভাবে জবাব দিল। ঠিক যেন সেই আগের সহজ স্বাচ্ছন্দ্য।

থাকগে, কি করছ এখন ? আমি প্রসঙ্গ ঘোরাতে চাইলাম।

অনেকদিন পরে মধুমিতার সঙ্গে দেখা। পুরনো প্রসঙ্গ তুলে আমি আবহাওয়া গম্ভীর করতে চাইছিলাম না।

মধুমিতা জবাব দিল, বললাম তো! আকস্মিকভাবে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার কাজ।

হেঁয়ালি ছাড়। ঠিক করে বলো। আমি জোর করলাম।

ক্যানভাসার। ক্যানভাসারের কাজ। বেশ টেনে টেনে বড় বড় করে বলল মধুমিতা।

ক্যানভাসার? আমি ভ্রূ কোঁচকালাম।

কেন, তাতে মান গেল নাকি? মধুমিতা সোজা প্রশ্ন করল।

আমি আমতা-আমতা করলাম, না, তা ঠিক নয়। তবে, তবে—।

তবে কি?

না, কিছু নয়। বলে আমি চুপ করলাম।

তোমরা সব পুরুষরাই সমান। কেউ মেয়েদের কোনো সম্মান দিতে জান না।

মস্তবড় অভিযোগ। এ-ক্ষেত্রেও যুক্তি ও সত্যতা আছে। সুতরাং আমার চুপ করে থাকাই শ্রেয়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। দুজনের মাঝে একটা অপরিচিত নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। দু-জনেই বোধহয় আমরা ভেবে নিচ্ছি এরপর কার কি কথা বলা উচিত।

মধুমিতাই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল, ভালো চাকরি পেয়েছ বুঝি?

আমি মাথা নাড়লাম।

খবর নাও না কেন? মধুমিতা জিজ্ঞেস করল।

কি করে জানব কোথায় আছ? আমি জবাব দিলাম।

ইচ্ছে করলেই জানা যায়।

তা অবশ্য ঠিক।

জানতে চাওনি বলো।

না, ঠিক তা নয়। তবে—।

তবে ভাবছিলে উচিত হবে কিনা। আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মধুমিতা বলল। মধুমিতা সত্যিই আমার মনের কথাটা বলেছে। অনেকদিনই আমি মধুমিতার কথা ভেবেছি। কোথায় আছে, কি করছে অনেকদিনই জানতে ইচ্ছে করেছে। ঔচিত্যবোধই বারবার আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মধুমিতা সেদিন অনেকক্ষণ আমার ওখানে ছিল। অনেক কথাই আমি জানলাম। মধুমিতা নিজের হাতে তার জীবনের মোড় ঘুরিয়েছে জেনে শেষ পর্যন্ত আমার সত্যিই খুব ভালো লেগেছিল।

শুনলাম বিবাহ-বিচ্ছেদের দু-মাসের মধ্যেই মধুমিতা চাকরি নিয়েছে। নিজের উপার্জনেই শ্যামবাজারের দিকে নতুন বাসা নিয়েছে। এখন সে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী, সম্পূর্ণ স্বাধীন।

একটা বড় প্রসাধন প্রতিষ্ঠানের প্রসাধনদ্রব্য প্রচারের কাজ। বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করতে হয়। বাড়ির মেয়েদের কাছে গুণাবলী জানানো তার দায়িত্ব। পাউডার, স্নো, ক্রিম, সাবান, সুগন্ধী দ্রব্য ইত্যাদি। প্রথম প্রথম মধুমিতার খুবই জড়তা লাগত। বিশ্রী লজ্জায় নিজেকে লুকিয়ে রাখতে ইচ্ছে করত। তা ছাড়া কত রকমের লোক আছে। কত রকমের ব্যবহার।

তবে এখন খুব ভালো লাগে মধুমিতার। কত রকম মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়। কতরকম বিচিত্র স্বভাবের মানুষ দেখা যায়। তার তাছাড়া কলকাতা শহরের মধ্যবিত্ত মানুষের রুচি-ফ্যাশান-চালচলন সম্পর্কেও সুন্দর একটা ধারণা জন্মে।

শেষকালে আমি মধুমিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের কোম্পানী বেশ ভালো মাইনে দেয় নিশ্চয়।

হ্যাঁ। বেশ ভালোই বলা চলে।

এ-সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন করা সমীচীন মনে না করে আমি চুপ করলাম।

তারপর মধুমিতা আরও অনেকদিন আমার আস্তানায় এসেছে।

আমিও শ্যামবাজারে তার আস্তানা দেখে এসেছি। একদিন নিজে হাতে রান্না করে সুন্দরভাবে খাওয়াল মধুমিতা। নিজের মতন করে সুন্দর সংসার পেতেছে।

আমি অবাক হলাম মধুমিতার আলমারি ভর্তি রাশি রাশি দেশী-বিদেশী বই দেখে। মধুমিতার এ-দিকটা সত্যিই আমার জানা ছিল না।

হেসে বললাম, এত বই কার?

পড়ার লোকের। মধুমিতা সংক্ষিপ্ত জবাব দিল।

আমি কি সেই পড়ার লোকের একজন?

মধুমিতা প্রতিবাদ করে উঠল, কখনো নয়। খবরদার, কোনো বইয়ে হাত দেবে না।

নতুন চরিত্রে সত্যিই অদ্ভুত লাগল মধুমিতাকে।

সুকুমারদাকে আমি কোনো কথা বলি নি। কিন্তু কিভাবে যেন সুকুমারদা মধুমিতার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা জানতে পেরেছিলেন। তারপর আমার কাছে সেই অন্যায় দাবি, ওর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক তোমার রাখা ঠিক নয়।

কেন? আমি প্রশ্ন করলাম।

তুমি সবই জান, তবে আবার জিজ্ঞাসা করছ কেন?

জানি। কিন্তু, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক না রাখার কোনো কারণ আমি দেখি না।

তুমি তাহলে সম্পর্ক ত্যাগ করবে না? সুকুমারদা অন্যায় জিদ ধরলেন।

অসম্ভব! এ আমি কিছুতেই পারব না।

বেশ। সুকুমারদা সম্পর্ক ত্যাগ করে চলে গেলেন।

তবু আমি পারি নি। মধুমিতার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

নতুন এক রূপে, নতুন এক চরিত্রে আজ আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে মধুমিতা।

মধুমিতা আমার কাছে স্বতন্ত্র, এবং তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল। আজও সে আমাকে দাদা বলে বটে কিন্তু মনে মনে আমি তাকে শ্রদ্ধা করি।

সরমা

সবে বেরোতে যাচ্ছি, মা পিছন থেকে ডাকলেন। দাঁড়িয়ে পড়লাম। বললাম, বলো।

মা বললেন, কাল রাতে কমল এসেছিল। তোর খোঁজ করছিল। তোর সঙ্গে ওর খুব দরকার।

কিছু বলে গেছে ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

না, সেরকম কিছু তো বলে গেল না। তবে তোর সঙ্গে এক্ষুণি দেখা করা দরকার বলছিল। মা চুপ করলেন।

আচ্ছা দেখা করব। বলতে বলতে আমি বেরিয়ে গেলাম।

রবিবারের সকাল। ভেবেছিলাম চায়ের দোকানে সিগারেটের ধোঁয়ায় মুখ ঢেকে বিশ্ব-সমস্যা আলোচনা করে কয়েক ঘণ্টা সময় মাথাটাকে একটু হাল্কা করে নেব। সারা সপ্তাহের ক্লান্তি আর একঘেঁয়েমিকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলবার এর চেয়ে সহজ উপায় আমার অন্তত জানা নেই। তাছাড়া চায়ের দোকানের আড্ডায় নিজেকে অকস্মাৎ কেমন ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষ মনে হয়। একবারের জন্যও মনে হয় না বয়স তিরিশ পেরিয়ে চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই করছে, কালো চুলের মাঝে হঠাৎ-হঠাৎ শাদা চুল আবিষ্কৃত হচ্ছে। মনে হয় বয়সের সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে বেশ কয়েকটা ধাপ পিছিয়ে গিয়েছি।

কিন্তু, কি জানি মা যেন সমস্ত গোলমাল করে দিলেন। কমলের এক্ষুণি কেন আমার সঙ্গে দেখা করা দরকার কিছুতেই মাথায় ঢুকল না।

কমলের সঙ্গে আমার প্রায় মাস তিনেক দেখা নেই। সেই যে সেবার আড্ডা মেরে সমস্ত রাতটাকে শাদা করে দিয়ে চলে গেল, তারপর ট্রামে-বাসেও আমি তার মুখ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কমলের ধরন-ধারণই এইরকম। ভূইফোঁড় গাছের মতো হঠাৎ গজিয়ে, সারাদিন, সারারাত আমার মনের আকাশে সন্ধ্যাতারার মতো জ্বল-জ্বল করবে, তারপর রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আকস্মিকভাবে কোথায় মিলিয়ে যাবে যে তাকালেও দেখা যাবে না। কমলকে তো আমি আজ থেকে দেখছি না। সেই ছেলেবেলার স্কুল-জীবন থেকে। যে-জীবনের স্মৃতি শ্লেটের দাগ মোছার মতো মন থেকে মুছে ফেলা যায় না, কমল আমার সেই জীবনের বন্ধু।

আমি নিজেও খানিকটা অবাক হয়ে গেলাম যখন দেখতে পেলাম নিজের অজান্তেই চায়ের দোকানের আড্ডায় আসার উল্টোপথে আমি কসবায় এসে পড়েছি। বুঝলাম, কমল আমাকে ভিতর থেকে আকর্ষণ করে। সে আকর্ষণ আমি বুঝতে পারি না। কিন্তু আকর্ষণ থেকে দূরে সরে দাঁড়াবার ক্ষমতা আমার নেই।

কড়া নাড়তে কমল কিন্তু দরজা খুলে দিল না। যে দরজা খুলে আমার চোখের সামনে দাঁড়াল তাকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। একমুহূর্ত মাত্র। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে জিগ্যেস করলাম, কি ব্যাপার? তুমি কবে এলে? চেরা ধানের মতো দুটি চোখ তুলে সরমা আমার দিকে তাকাল। কোনো কথা বলল না। এমন কি দরজা ছেড়েও সরে দাঁড়াল না, যাতে আমি ভিতরে ঢুকতে পারি।

বাধ্য হয়েই আমাকে মুখ ফুটে বলতে হল, দরজাটা ছাড়, না হলে ঢুকি কি করে।

সরমা দরজা ছেড়ে দাঁড়াল।

কমলের বাড়ি। আমার অবাধ অধিকার। আমি সোজা কমলের বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম। মাথাটায় কেমন যেন জট পাকিয়ে গেল। সরমাকে এই বেশে এখানে দেখতে পাব ভাবি নি কোনোদিন। যতদূর মনে পড়ছে বছর তিনেক আগে সরমাকে দেখেছি। আর আগের বছরই সরমার বিয়ে হয়েছিল। সরমা কমলের আদরের বোন। কমলের এমন কিছু রোজগার না থাকলেও সরমার বিয়েতে সে অনেক খরচ করেছিল। আমি জানি সেই ঋণের বোঝা কমলের ঘাড় থেকে এখনও সম্পূর্ণভাবে নামে নি। এখনও মাসে-মাসে কমল তার জের টেনে যাচ্ছে।

বছর তিনেক আগে সরমা এসেছিল। আর সেদিন ভোরবেলায় হামলা করে কমল আমাকে সত্যি বলতে কি জোর করেই ধরে এনেছিল। সরমার প্রতি আমার বিশেষ দুর্বলতার কথা কমল জানত। বিয়ের আগে এ-নিয়ে সরমাকে নাকি সে জিজ্ঞেসও করেছিল।

সরমা নাকি সেদিন শুধু অবাকই হয় নি, চমকেও উঠেছিল, তোমার মাথা খারাপ?

কেন?

সতুদাকে আমি দাদার মতো শ্রদ্ধা করি। সতুদা জানলে কি বিশ্রী হবে।

সতুদা তো অন্যকিছুও জানতে পারে। কমল বলেছিল।

আমি বিশ্বাস করি না। সতুদাকে আমি ছেলেবেলা থেকে চিনি। এরকমের ভাবনা তার মনের মাঝে আসতেই পারে না।

ঠিকই বলেছিস। আমি তোকে শুধু একটু বাজিয়ে দেখছিলাম। বলে কমল প্রসঙ্গ ঘুরিয়েছিল। আর সরমা সেদিন নাকি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল।

আমার বিছানায় আমার পাশে আধশোওয়া হয়ে কমলই আমাকে

এই গল্প করেছে। আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শুধু ভেবেছি, ঈশ্বর যদি শ্রদ্ধার পর্দাটা আমার সামনে থেকে একবার খুলে ফেলতেন!

তারপর যথারীতি আমাকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে নিজের পছন্দ-মতো সরমা বিয়ে করেছে। বিয়ের একবছর পর তাকে দেখে মনে হয়েছে, জীবনকে দুই করতলে রেখে সে খেলা করছে। তার চোখে মুখে, সারা শরীরে নেচে-নেচে বেড়াচ্ছে যেন স্বপ্নের শিশুরা! হাসনাহানার তীব্র গন্ধের মতো তার শরীর থেকে সবসময় যেন বেরিয়ে আসছে একটা মাধুর্যের সুবাস।

সেদিন সরমার দিকে তাকিয়ে আমি মনে-মনে ভীষণ তৃপ্তিবোধ করেছিলাম। সরমার পরিপূর্ণতায় আমার নিজেরও কেমন ভালো লাগছিল। চলাফেরায়, কথাবার্তায় সরমার জীবনের ছন্দ আমারও মনের মাঝে কেমন আন্দোলন আনছিল। ঠিক বোঝানোর নয়, বোঝার। ঠিক বলার নয়, অনুভবের।

সরমার স্বামীকে আমি দেখি নি। শুনেছিলাম খুব পুরুষালী চেহারা, সদা হাস্যময়। সরমার জীবনের বিকাশের পথে সেই ভদ্রলোকের কৃতিত্বই সবটুকু বুঝে দূর থেকে তাকে আমি শ্রদ্ধাই করতাম।

সরমা সেদিন আমাকে ঠাট্টা করে বলেছিল, তোমার ঐ গম্ভীর্যের মুখোশ এঁটে বেড়ালে তোমার কপালে কিছুই জুটবে না সতুদা। একটু ভালো করে হাসো। মেয়েরা হাসি পছন্দ করে।

আমি সরমার দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়েছিলাম। কোনো জবাব দিতে পারি নি। সরমার কথাগুলোর মধ্যে একটা গভীর সত্য লুকিয়ে আছে বলে আমার সেদিন মনে হয়েছিল।

সরমা সেবার দিন তিনেক ছিল। আমি সেদিন ফিরে এসে আর যাই নি। কমলও আমাকে আর বিরক্ত করে নি। কমল আমাকে ভালোবাসে, আমাকে বোঝে। কমল বুঝেছিল, আমি চট্ করে সহজ হয়ে উঠতে পারব না।

সরমাকে সত্যিই আমি ভুলতে পারি নি। আজও না। কমলও বোধহয় টের পেয়েছে, আর পেয়েছে বলেই কোনো প্রসঙ্গেই সে সরমার কথা আমার কাছে তুলতে চায় না। মাঝেমধ্যে বড় জোর সরমার খবরাখবর দেয়। কমল জানে সরমার শুভসংবাদ আমাকে তৃপ্তি দেয়। সেই তৃপ্তি দেওয়াটুকু বন্ধু হিসাবে তার পবিত্র কর্তব্য বলে সে মনে করে।

কিন্তু আজ? আজ কমল আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছে? তৃপ্তিবোধের মূল্য শোধ করতে কি আজ আমি এখানে এসেছি? সরমার স্পন্দনহীন নীরব ছন্দ অনুভবের কঠিন দায়িত্ব পালন করা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুকনো রজনীগন্ধার মতো সরমার এ রূপ আমি সহ্য করতে পারছি না। কমলের বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আমার বারবার মনে হতে লাগল, আমি যেন আস্তে-আস্তে কোথায় কোন গভীরে তলিয়ে যাচ্ছি! অস্তিত্বহীনতার অনুভূতি আমাকে প্রতিমুহূর্তে আঘাত করতে লাগল। আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল, সরমা, তুমি আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাও। না, না, তোমার বর্তমান রূপ আমি দেখি নি। আমি অতীত নিয়ে বাঁচতে চাই। তুমি, তোমার অতীতের মাঝে ফিরে যাও সরমা।

কমল এসে আমাকে বাঁচাল। চেয়ারটা আমার কাছে টেনে এনে বসল, কতক্ষণ এসেছিস?

আমি কমলের দিকে তাকালাম। হঠাৎ কমলেরও যেন অনেকটা বয়স বেড়ে গেছে বলে মনে হল। আয়নায় আমার নিজের মুখ দেখতে ইচ্ছে করল। মনে হল, আমারও নিশ্চয় বয়স বেড়ে গেছে কমলের মতোই।

কমল একটা সিগারেট ধরাল। তারপর আনমনে কয়েকটা টান দিয়ে আবার আমার দিকে তাকাল।

আমি উঠে বসলাম।

কমল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, কি করা যায়?

কতদিন? আমি সংক্ষেপে প্রশ্ন করলাম।

মাসখানেক।

খবর দিস নি কেন?

হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে চলে গেলাম। তোকে খবর দেওয়ার সময় পাই নি।

কিভাবে মারা গেলেন? আমি সোজা প্রশ্নে এসে পড়লাম।

জিপ্ অ্যাকসিডেন্ট। স্পটেই শেষ। ইণ্টারন্যাল হেমারেজ—বলেই মনের উত্তেজনা চাপবার জন্যে বারবার সিগারেটের ছাই ঝাড়তে লাগল কমল।

সরমার মনের অবস্থা কিরকম? সব জেনেও আমি জিজ্ঞেস করলাম।

বুঝতেই পারছিস্। ওর দিকে আমি তাকাতে পারছি না।

আমি চুপ করে থাকলাম। কমল জানে, কমলের চেয়ে কোনো অংশে কম খারাপ আমার মনের অবস্থা নয়।

কমল তার ঠাসা চুলের মাঝে হাত দিয়ে বলল, সবচেয়ে সমস্যা দাঁড়িয়েছে কি জানিস, একটা পয়সাও রেখে যায় নি; এমনকি একটা লাইফ ইনসিওরেন্স পর্যন্ত করে নি।

কি করে বুঝবে বল। আমি সান্ত্বনা দিলাম।

তা অবশ্য ঠিক।

তাছাড়া তুই তো আছিস।

সেকথাও ঠিক। কিন্তু সরমাকে বোঝানোই যাচ্ছে না। এখানে আসার আগেই শুরু করেছে, আমাকে একটা কাজের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও দাদা।

আর কিছুদিন যাক্, এক্ষুণি কি দরকার?

আমি তো তাই বলছি। কিন্তু ওকে বোঝানো কঠিন। নাছোড়-বান্দা। তুই একটু বলে দেখ্ না।

আমি বুঝলাম অসম্ভব। কমল যা পারে নি, আমার পক্ষে তা

কোনোমতেই সম্ভব নয়। তাছাড়া আমার যা মনের অবস্থা তাতে আমি সবকিছু বোধহয় ঠিকমত গুছিয়ে বলতেও পারব না।

হঠাৎ আমার মাথায় উপায় এসে গেল। বললাম, মাকে বলেছিস্?

না। কমল জবাব দিল।

কেন?

কি জানি মাসীমাকে আমি বলতে গিয়েও বলতে পারি নি। কেমন যেন একটা বিশ্রী কান্না ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছিল।

কমলের মা নেই। আমার মাকেই কমল নিজের মায়ের মতো শ্রদ্ধা করে। বুঝলাম, সহজ কথা সহজ করে কমলের পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

শেষকালে সেদিন বাড়ি ফিরে মাকে সবকিছু বললাম। সব শুনে মা কিছুক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে বসে থাকলেন। এবং শুধু বললেন আমি সকালে যাব।

পরদিন মা গেলেন। এবং সরমাকে আমাদের বাড়িতেই নিয়ে এলেন। পাশের ঘরে বসে আমি আর কমল চাপা কান্না শুনলাম আর পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

আমাদের বাড়িতে কয়েকদিন থাকল সরমা। এবং মা-ই শেষ-পর্যন্ত সব ব্যবস্থা করলেন। আমি আর কমল দুজনে গিয়ে সরমাকে রেখে এলাম। নারী-মঙ্গল সংঘে। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এই কয়েকদিন আমার সঙ্গে একবারের জন্যও কোনো কথা বলে নি সরমা। একবারের জন্যও তার চেরাধানের মতো চোখ তুলে আমার দিকে তাকায় নি। কিন্তু নারী-মঙ্গল সংঘ থেকে ফিরবার আগে সরমা কথা বলল, মাঝে মাঝে খবর নিয়ো সতুদা।

আমি কোনো জবাব দিতে পারলাম না। কমল আমার দিকে তাকাল। তারপর চুপচাপ নিঃশব্দে দু-জনে বেরিয়ে এলাম। এবং সেই মুহূর্তে পৃথিবীকে মনে হল, বড় বেশি বিষাদময়। বাতাসকে

মনে হল, বড় বেশি ভারবহ, নিঃস্পন্দ। আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হল, বড় বেশি ছোট, বড় বেশি নীরব। ফিরবার আগে সরমার চোখের গভীরে আমি যেন সেই বিষাদের ছবি দেখেছিলাম। আমার অনুভূতির পাগলা ঘোড়াটাকে হঠাৎ যেন লাগাম ধরে বশ মানিয়ে দিয়েছিল সরমা।

এক বছর কেটে গেছে। সময় ধীরে ধীরে সরমার মনের বিষণ্ণতাকে মুছে ফেলেছে। সাবলম্বী চেতনা সরমাকে শক্তি দিয়েছে। অস্তিত্বের সংগ্রামে আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সরমা। সরমা হাতের কাজ শিখেছে। টেলারিং-এর কাজে সমানে বাজারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে সে। নারী-মঙ্গল সংঘের সম্পাদিকা মাকে ডেকে বলেছেন, সরমা এত তাড়াতাড়ি এত ভালো কাজ শিখেছে যে আমাকে পর্যন্ত অবাক করে দিয়েছে।

মা এসে আমার কাছে গল্প করেছেন। আমি ঠিক আগের মতোই তৃপ্তিবোধ করেছি। সরমা যেন নতুন মূর্তি ধরে আমার চোখের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

কমলও যেন আবার নতুন বয়স ফিরে পেয়েছে। আগের মতোই উপস্থিত হয়ে রাত শাদা করে ফিরে যায়। অতীতটাকে খুব তাড়াতাড়ি যেন আমরা সবাই ঝেড়ে ফেলতে পেরেছি।

আরো কিছুদিন পরের ঘটনা। সরমা নিজের টেলারিং শপ্ করেছে। কমল আর আমি অনেক কষ্টে টাকা সংগ্রহ করে দিয়েছি, মেশিন কিনেছি। কমলের সঙ্গে সঙ্গে সরমার জন্য আমিও যেন মেতে উঠেছি। সরমার সার্থকতার মধ্য দিয়ে আমি যেন জীবনে সার্থকতা লাভ করতে চলেছি।

সরমা আরও দু-জন দর্জি রেখেছে। নিজের হাতে কাটে। নিজে কাজের তদারকী করে। আমি গেলে ভালো করে কথা বলারও সময় হয় না। বলে, একটু বসো সতুদা, এবারই ফ্রি হয়ে যাব।

কিন্তু ফ্রি সত্যিই সরমা হতে পারে না। আমার দূর থেকেই দাঁড়িয়ে শুধু দেখতে ইচ্ছে করে সরমার কর্মব্যস্ত জীবনের ছন্দ। এক নতুন জীবনছন্দে স্পন্দিত সরমা।

তারপর একদিন সরমার কাছে গেলে সরমা বলল, বসো সতুদা, তোমার সঙ্গে দরকার আছে। সেদিন দোকানে খুব ভিড় ছিল না। আমি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। হঠাৎ সরমা ভিতর থেকে একটা খাম এনে আমার হাতে দিল, প্রমিজ কর, এটা খুলবে না এখন, বাড়ি গিয়ে খুলবে।

কি আছে বলো। আমি সরমার দিকে তাকালাম।

না, আগে প্রমিজ কর। ছেলেবেলার সেই বিনুনিদোলানো মেয়ের মতো সরমা আব্দার ধরল।

আচ্ছা, প্রমিজ? আমি অগত্যা বললাম। কিন্তু ভিতর-ভিতরে কেমন একটা চাঞ্চল্য, কেমন উত্তেজনা অনুভব করতে লাগলাম। আমার বারবার মনে হতে লাগল সরমা বোধহয় প্রেমে পড়েছে কারো, নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে চায়। সেই কথাই সে জানাতে চেয়েছে চিঠির ভেতর।

চাঞ্চল্য আর উত্তেজনা নিয়ে বাড়ি ফিরে সোজা নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে খাম ছিঁড়ে ফেললাম। খাম খুলে আমি অবাক—ভয়ানক অবাক হয়ে গেলাম। খামের ভিতরে পাঁচশো টাকার নোট, আর একটুকরো চিঠিঃ সতুদা, তোমার ঋণ আমার জীবনে শোধ করবার নয়! তোমাকে আমি দাদার মতোই শ্রদ্ধা করি। তুমি গোপনে দাদাকে অনেক টাকা আমার জন্যে দিয়েছ আমি জানি। এ-ঠিক ঋণ-শোধের স্পর্ধা নয়। ছোটবোনের প্রণামী বলে ধরে নিয়ো।

চুপচাপ চিঠিখানার দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমি। সরমার মুখখানা বারবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। সরমাকে সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অন্য জাতের, অন্য জগতের মানুষ—আমি যেন তাকে ঠিক চিনতে পারছিলাম না।

আনন্দ আর গর্বে হঠাৎ দু-চোখ আমার ঝাপসা হয়ে গেল।

মনীষা

আমি অবাক হয়ে গেলাম।

কাগজ আর কালির গভীরে একটা মুখ বার বার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, শরতের সকালের মতো স্বচ্ছ, শিশিরবিন্দুর মতো কোমল, বর্ষাভেজা ঘাসের মতো সবুজ দুটি চোখ মেলে মনীষা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে সেতারের তারের মতো তার ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠছে। কি যেন বলতে চাইছে সে। অথচ আমি শুনতে পাচ্ছি না। নিস্তব্ধতার গভীরে কান পেতেও আমি শুনতে পাচ্ছি না। কেবল যেন একটা ভাসা-ভাসা শব্দ। শব্দের গভীরে যেন আরও আরও অনেক শব্দ।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। না, কোনো শব্দই আমার কাছে স্পষ্ট নয়। অস্পষ্ট অতীত। ঘসা কাঁচে চোখ রেখে দেখার মতো কিছু ছবি। কপোতাক্ষ তীর·· বাবলা গাছ ··একজোড়া টিয়া পাখি··· সবই আমার কাছে কেমন যেন হারিয়ে যাওয়া দৃশ্য। চোখ বন্ধ করলে অস্পষ্ট, চোখ খুললে শূন্যতা।

তবু দুটি চোখ, মনীষার চোখ, আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি ভাবলাম, ভাবলাম, আর ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি ধরে ধরে অনেকটা পিছনে নেমে এলাম।

মনীষা আব্দার ধরল তাকে নিয়ে যেতে হবে।

আমি প্রতিবাদ করলাম, তোর কি মাথা খারাপ?

কেন? ছোট্ট প্রশ্ন।

আমরা সব ছেলেরা যাচ্ছি। তাছাড়া ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে। তোকে নিয়ে যাব কি করে? আমি বোঝাতে চাইলাম।

ভারি তো সব ছেলে! তোমাদের চেয়ে আমার অনেক সাহস আছে। না, আমাকে নিতেই হবে। মনীষা নাছোড়বান্দা।

অগত্যা মনীষার মাকে বলতে হল।

মনীষার মা, অর্থাৎ অনুমাসী প্রথমটা আমতা-আমতা করলেন। কিন্তু মনীষা মার গলা জড়িয়ে ধরে আব্দার শুরু করল, সতুদা তো আছে। কিছু হবে না।

অনুমাসী আমার দিকে তাকালেন।

আমার কি হল বলতে পারব না। আমি ফস করে বলে ফেললাম, হ্যাঁ, আমি তো আছি।

মনীষা তার কৈশোরের চোখদুটি তুলে আমার দিকে তাকাল। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম।

অনুমাসী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সাবধানে যেয়ো। তোমাদের সব বিশ্বাস নেই। নিজেরা নৌকো বেয়ে যাওয়ার কি দরকার বুঝতে পারি না। মদনকে সঙ্গে নিলে পারতে।

মদনদা? বলে হো-হো করে হেসে উঠল মনীষা।

কেন? মদনের নাম শুনে হাসবার কি আছে? বলে অনুমাসী মনীষার দিকে তাকালেন। মনীষার চোখে-মুখে তখনও হাসির ঢেউ যেন ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে।

আমি জানি মুখে একথা বললেও অনুমাসীও মনে মনে হাসছিলেন। অনুমাসীর চোখের কোণে সেই হাসির চিহ্ন যেন ফুটে উঠছিল।

আমি মুখ টিপে টিপে হাসছিলাম।

মদনদা আমাদের বাড়িতে কাজ করে। জাতে ওড়িয়া। কিন্তু

এখন পুরোমাত্রায় বাঙালী। আমার জ্ঞান হয়ে অবধি মদনদাকে কোনোদিন দেশে যেতে দেখি নি।

মদনদার চোখ দুটি ট্যারা। সামনে তাকালে মনে হয় পিছনে তাকাচ্ছে। পিছনে তাকালে মনে হয় পাশে তাকাচ্ছে। সামনের দুটি দাঁত উঁচু কোদালের মতো।

মনীষা উঠতে-বসতে মদনদার পিছনে লাগে। কিন্তু আশ্চর্য! মদনদা একবারের জন্যে রাগ করে না। বড়জোর উঁচু দাঁতের ফাঁকে মিষ্টি হেসে বলে, মেয়েটাকে যে ঘরে নেবে, তার কপালে অশেষ দুঃখ।

মনীষা তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়, তুমি নেবে মদনদা?

এরপর মদনদার পিছুহটা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

যাহোক, মদনদার প্রসঙ্গ চাপা পড়ল।

মনীষাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা রওনা দিলাম।

আমাদের গ্রাম থেকে দশ মাইল পথ। নদীতে ভাঁটা। আমাদের উজান বেয়ে যেতে হবে। আমরা তিন বন্ধু। আমি, শিবু, পলা। নিজেরা নদীতে ভেসে আসা নৌকো ধরেছি। এখন তার মালিক আমরাই। দশ দিন হয়ে গেছে। কেউ কোনো খোঁজ করে নি। অন্য গাঁয়ে বন্ধুর বাড়ি যাব। শখ, নিজেদের নৌকোয় নিজেরা যাব। এর মধ্যে মনীষার আব্দার। মনীষা সঙ্গে জুটেছে।

আমি বৈঠায় বসলাম। ওরা দাঁড়ে বসল। আর আশ্চর্য, মনীষা সমান তালে ওদের সঙ্গে দাঁড় বেয়ে চলল। শিবু, পলা মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে দাঁড় ছাড়ল। কিন্তু মনীষা একেবারের জন্যও নয়। উজানে, সমান তালে দাঁড় ফেলতে লাগল।

আমি হেসে বললাম, ধন্যি মেয়ে বাবা!

মনীষা হাত দিয়ে আমার দিকে খানিকটা জল ছুঁড়ে দিয়ে বলল, কে মেয়ে? আমি না ওরা?

শিবু আর পলা লজ্জা পেয়ে আবার দাঁড়ে হাত লাগাল।

একটু পরে আমরা জোয়ার পেলাম। ওরা দাঁড় ছাড়ল। আমি চুপচাপ হাল ধরে বসে থাকলাম। নদীর স্রোতে আপন মনে ভেসে চলল আমাদের নৌকো।

মনীষা নৌকোর অন্যমুখে শরীর এলিয়ে দিয়ে দুই হাত মাথার নিচে রেখে আকাশের দিকে তাকাল। আকাশে তখন কালো মেঘের আনাগোনা। আমার মনে হল বৃষ্টি হতে পারে।

মনীষা গান ধরল, সুরের গুরু, দাও হে সুরের···

বাতাসে-বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল মনীষার গানের সুর। আর আমরা তিনজন নীল চোখের মতো নদীর দিকে তাকিয়ে মনীষার গানের মাঝে ডুবে গেলাম।

ফিরতে সত্যিই আমাদের রাত হয়ে গেল। আর ফিরবার সময় বন্ধুদের বাড়ি থেকে একজোড়া টিয়াপাখি নিয়ে এল মনীষা। দুই টিয়াপাখিকে বুকের মাঝে ধরে নৌকোর মাঝে চুপচাপ বসে থাকল মনীষা। আমি লক্ষ্য করলাম, গভীর ভালোবাসায় ছোট্ট হাতে টিয়া-পাখির গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অসীম বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে মনীষা।

নদীতে ভাঁটা। আমরা স্রোতে নৌকো ভাসিয়ে দিয়েছি।

আকাশে ঘন কালো মেঘ। নদীতে মিসমিসে কালো অন্ধকার। চারিদিকে থমথমে নিস্তব্ধতা। শিবু, পলা চুপচাপ বসে আছে। ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা করছে সবাই। অনেকটা পথ আমাদের যেতে হবে। ঝড় উঠলে বিপদের সম্ভাবনা। আমার চিন্তা হচ্ছিল মনীষার জন্য। অনুমাসী আমার কথায় ছেড়ে দিয়েছেন। ভালোয়-ভালোয় কোলে ফিরিয়ে দিতে পারলে হয়।

আশঙ্কা সত্যি হল। ঝড় নয়। একটু পরে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। আমি গায়ের জামা খুলে মনীষার দিকে ছুঁড়ে দিলাম, ভালো করে মাথা ঢেকে নে।

কিন্তু নিজের দিকে মনীষার বিন্দুমাত্র নজর নেই। টিয়াপাখিকে নিয়ে সে ব্যস্ত। আমার জামা দিয়ে সে ভালো করে টিয়াপাখি দুটোকে ঢেকে কোলের মাঝে চেপে ধরল।

আমি আবার বললাম, মনীষা, মাথাটা ঢেকে নাও। তোমার অসুখ হবে।

কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হল তার কানে কথাকটি ঢুকল বলে আদৌ মনে হল না। নিজের শরীরটাকে বেঁকিয়ে, সমস্ত পিঠের মাঝে বৃষ্টির ঝাপটা সহ্য করে সে টিয়াপাখি দুটিকে আরও নিরাপদ করতে চাইল।

আমি আর কথা বললাম না। ওর ভালোবাসার মমতায় শুধু বিস্ময়ে অভিভূত হতে লাগলাম।

মনীষার সত্যিই অসুখ হল। প্রচণ্ড জ্বর। ডাক্তার ডাকা হল। ডাক্তার রায় দিলেন, নিউমোনিয়া।

আমি নিজেকে অপরাধী মনে করলাম। আমার বার বার মনে হতে লাগল, মনীষার অসুখের জন্যে আমিই দায়ী।

মনীষার শয্যার পাশে আমি বসে থাকতাম। অনেক দিন রাত জাগতাম। অনুমাসী আমার মাথায় হাত দিয়ে বলতেন, সতু, তোমার সামনে পরীক্ষা। তুমি বাড়ি যাও।

কি জানি আমি কিছুতেই বাড়ি যেতে পারতাম না। পিছন থেকে কে যেন আমাকে টানত। আমি কিছুতেই যেতে পারতাম না। মনীষার রুগ্ন একজোড়া চোখ যেন পিছন থেকে আমাকে টেনে রাখত।

মনীষার আদরের টিয়াপাখির দায়িত্ব নিয়েছিলাম আমি। মনীষাকে কথা দিয়েছিলাম। মনীষা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করত, সতুদা, আমার টিয়াপাখি ভালো আছে তো?

আমি মনীষাকে আশ্বস্ত করতাম।

আস্তে আস্তে মনীষা ভালো হয়ে উঠল। একজোড়া টিয়াপাখির দায়িত্বভার তার উপর অর্পণ করে আমি পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

পড়ার সময় মনীষা আমাকে খুব বিরক্ত করত না। শুধু মাঝে মাঝে টিপ্পনী কাটত, যা পড়ার ধূম। তুমি এবার একটা কেলেঙ্কারী না করে ছাড়বে না সতুদা!

আমি শুধু হাসতাম। কোনো কথা বলতাম না।

তারপর পরীক্ষা হয়ে গেল। আমার অফুরন্ত অবসর। কপোতাক্ষ-তীরের সেই বাবলাগাছের নিচে বসে বসে আমি নদীর কলতান শুনতাম। কি জানি মনে হতো, নদী যেন আমাকে ডাকছে। নদীর দিকে তাকিয়ে আমার নিজেকে কেমন যেন বিরাট, বিশাল মনে হতো।

মনীষা আমার পাশে এসে বসত। আর আমাকে কত রকমের যে প্রশ্ন করত! মনীষার সব প্রশ্নের জবাব আমার জানা ছিল না।

মনীষা একদিন আমার দিকে তাকিয়ে বলল সতুদা, তুমি বড় হয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে এসো। কত রকমের দেশ, কত রকমের মানুষ। আমার বইতে পড়তে খুব ভালো লাগে।

তুমিও তো যেতে পার! আমি মনীষার চোখে চোখ রেখে বলতাম।

ধ্যেৎ, তোমার মাথা খারাপ! বলে মনীষা অন্যদিকে মুখ ফেরাত।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমি কপোতাক্ষ-তীরে, বাবলাগাছের নিচে বসে মনীষাকে একদিন বলেছিলাম, আমি তোমাকে সারা পৃথিবী দেখাব মনীষা!

দুজনেই তখন আমরা ছেলেমানুষ। যে-কথা বলতাম তার পুরো অর্থ বুঝতাম না। সব কিছুর অর্থ বোঝার বয়স তখনও হয় নি।

আর যখন অর্থ বোঝার বয়স হয়েছে, অর্থ বুঝে যখন কথা বলি,

অর্থ বুঝে যখন কথা শুনি, তখন আমি কোথায়, মনীষা কোথায়! কোথায় সেই কপোতাক্ষ-তীর, কোথায় সেই বাবলগাছ, কোথায় সেই একজোড়া টিয়াপাখি!

অতীতের মাঝে ডুব দিয়ে আবার আমি বর্তমানে এসে উঠলাম। হাতে একটুকরো চিঠি। মনীষা লিখেছে: ইচ্ছে করলে একবার দেখা করতে পার। খুশি হব।

কিন্তু, কি করে মনীষা আমার ঠিকানা জানল। কত বছর কেটে গেছে! মনীষার কোনো খবরই তো আমি রাখি না। পুরো পৃথিবী না হলেও অনেক দেশ আমি ঘুরে এসেছি। মনীষাকে যে-কথা দিয়েছিলাম, তা তো একবারের জন্যও মনে পড়ে নি। পৃথিবীতে মনীষার অস্তিত্বও তো একেবারের জন্য অনুভব করি নি। জনপদের পথে পথে শুধু অনুভব করেছি নিজের অস্তিত্ব, নিজের ভবিষ্যৎ।

নিজেকে হঠাৎ কেমন যেন খাটো মনে হল। বৃহৎ পৃথিবীর মাঝে নিজেকে মনে হল, ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র। মনে হল, তুচ্ছতা আমার সমস্ত দেহে-মনে গোপনে-গোপনে আশ্রয় করেছে। আমি কোনোদিন তা বুঝি নি, বুঝবার চেষ্টাও করি নি।

জীবনকে নিক্তিতে মেপে মেপে ওজন করেছি। অর্থ, যশ, খ্যাতির সম্ভাবনায় উন্মাদ হয়ে উঠেছি। সময়র মতো প্রচণ্ড গতিতে শুধু চলেছি আর চলেছি। বিয়ে করেছি। সংসার করেছি। কলকাতা শহরের কোলাহলে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছি। কোলাহলের গভীরেও যে অন্য কিছু আছে তা ভাববার কোনো অবসর হয় নি কোনোদিন।

মনীষার এই ছোট্ট চিঠি আজ যেন আমার আমিকে আঙুল উঁচিয়ে চিনিয়ে দিল। অতীতকে চোখের সামনে বর্তমানের মতো স্পষ্ট করে দিল। অতীত-বর্তমান সব মিশে একাকার হয়ে গেল।

আর সত্যি, তখনই আমি চমকে উঠলাম।

স্টেশনে নেমে মনীষার বাড়ি চিনতে আমার অসুবিধা হয় নি। চিঠিতে ঠিকানা দেওয়া ছিল। রিক্সাওয়ালাকে বলতেই সে সোজা মনীষার বাড়ির সামনে নিয়ে আমাকে নামিয়ে দিল।

ছোট একতলা বাড়ি। সামনে এক ফালি বারান্দা। দরজায় পর্দা ঝুলছে। গাঢ় সবুজ রঙের পর্দা। টিয়াপাখির রঙের মতো। মনীষার নাম ধরে ডাকতে কি জানি কেন আমার খুব খারাপ লাগছিল। রিক্সাওয়ালার ভাড়া চুকিয়ে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম। গভীর নিস্তব্ধতা। বাড়িতে কোনো মানুষ আছে বলে মনে হচ্ছিল না।

আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ একটা চেনা কণ্ঠস্বর সুদূর অতীত থেকে যেন আমাকে ডাকল, আরে, সতুদা, দাঁড়িয়ে আছ কেন? উঠে এসো।

আমার চিনতে একটুও অসুবিধা হল না। মনীষা আমাকে ডাকছে। অনেকগুলো বছর যেন চোখের সামনে কলরব করে উঠল। আমার মনে হল, কপোতাক্ষ-তীরের সেই বাবলাগাছের নিচে দাঁড়িয়ে মনীষা যেন আমাকে ডাকছে।

আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম।

মনীষা আমার সামনা-সামনি বসল। আমি কোনো কথা বলতে পারছিলাম না। দুই চোখ মেলে শুধু ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

মনীষা হাসল, কি দেখছ অমন করে?

আমি ফস করে বলে ফেললাম, তোমাকে।

আর মনীষা তখনই তার চোখের পাতা দুটি নিচের দিকে নামিয়ে নিল।

তারপর সারাদিন মনীষার বাড়িতে থাকলাম। আর দুজনে মুখোমুখি বসে অতীতের দিনগুলোকে সামনে ধরে-ধরে খেলা করলাম। অতীত সত্যিই মধুর। অতীতকে কাছে টানতে সত্যিই ভালো লাগে। অন্তত সেই মুহূর্তে এই কথাটুকু আমি অনুভব করেছিলাম।

মনীষা বিয়ে করে নি। কেন, আমি জানি না। মনীষাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি নি। কেন তাও বলতে পারব না। নিজের মাঝেই জীবনকে গুটিয়ে নিয়েছে মনীষা। অন্তর্মুখীনতায় সে এখন আত্মস্থ।

কলকাতা মনীষার ভালো লাগে না। কলকাতার কোলাহলে সে নাকি বড় ক্লান্ত। কলকাতা থেকে দূরে শহরাঞ্চলে এক কারখানায় তাই সে চাকরি নিয়েছে। টেলিফোন অপারেটরের চাকরি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, চাকরি তোমার ভালো লাগে মনীষা ?

চাকরি, চাকরিই। এতে ভালোলাগার কি আছে ? তবে খারাপ লাগে বলে তো মনে হয় না। মনীষা জবাব দিল।

ব্যবহার ?

খারাপ তো দেখি না।

বড্ড বোরিং, তাই না ?

জীবনটাই তো বোরিং। বলে মনীষা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

আমি চুপ করলাম, আর প্রশ্ন করা সমীচীন নয়। না-জেনে, না বুঝে, মনীষার মনের গভীরে কোথাও হয়তো আমি আঘাত দিয়ে ফেলেছি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে মনীষা হাসল, কেন চিঠি লিখলাম, জিজ্ঞেস করলে না তো।

কি জিজ্ঞেস করব, বলো।

হঠাৎ এত বছর পরে তোমাকে চিঠি লিখলাম কেন ?

এমনি ! মনে পড়েছে তাই। আমি বললাম। এছাড়া আর কিছু আমার জানা ছিল না।

এমনও তো হতে পারে কোনো কাজ আছে। মনীষা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। যেন আমার সমস্ত ভিতরটা সে দেখতে চাইল।

আমি ওর তীক্ষ্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, হতে পারে।

আর সঙ্গে সঙ্গে মনীষা হো-হো করে হেসে উঠল, যতই তোমার যশ-খ্যাতি হোক না কেন সতুদা, তুমি এখনও ঠিক আগের মতো ছেলেমানুষই আছ।

মনীষার কথার কোনো অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না। চুপচাপ ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

আচ্ছা, পরে জানাব। বলে মনীষা আবার গম্ভীর হয়ে গেল।

আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, রাত হয়েছে, এবার আমি উঠি। আটটায় বোধহয় ট্রেন।

মনীষা বাধা দিল না।

আমি উঠে এলাম।

তারপর অনেকদিন, অনেকবার আমি মনীষার কাছে গিয়েছি। কেন সে আমাকে চিঠি দিয়েছিল জানায় নি। আমিও জানতে চাই নি।

এর যথার্থ কারণ আমি নিজেও জানি না। হয়তো সে নিঃসঙ্গ, হয়তো আমি, তাই···